ইসলামে গণতন্ত্রের ধারণা:

প্রথমতঃ

ডেমোক্রেটিক (গণতন্ত্র) আরবী শব্দ নয়। এটা একটি গ্রীক শব্দ, যা দু’টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত । এক: DEMOS যার অর্থ হলো, জনগণ বা জাতি। দুই: KRATIA যার অর্থ শাসন। সুতরাং এর সমষ্টিগত অর্থ দাঁড়ায়, জনগণের শাসন।

দ্বিতীয়ত:

গণতন্ত্র হলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক একটি শাসনব্যবস্থা। কেননা, এটা আইন প্রনয়নের ক্ষমতা জনগণ বা তাদের প্রতিনিধি তথা সংসদ সদস্যদের হাতে অর্পন করেছে। সুতরাং এ ভিত্তিতে এতে শাসনক্ষমতা সম্পূর্ণ গাইরুল্লাহর জন্য; বরং জনগণ ও তাদের প্রতিনিধিদের জন্য সাব্যস্ত হয়। এতে সবার ঐক্যমতের হিসেবে নয়; বরং সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্যতা পায়। সংখ্যাগরিষ্ঠদের ঐক্যমত সমর্থিত সিদ্ধান্ত জাতির জন্য অবশ্য পালনীয় আইনে পরিণত হয়ে যায়। যদিও তা সত্ত্বাগত স্বভাব, ধর্ম ও বিবেকবিরূদ্ধ হয়। তাই এ ব্যবস্থাপনাতেই ভ্রুণমোচন, সমকামী বিবাহ, সুদভিত্তিক সুবিধাদি, শরয়ী বিধিবিধান বিলুপ্তি, ব্যভিচার ও মদপানের লাইসেন্সের আইন পাশ হয়েছে। বরং বলা যায়, এ ব্যবস্থাপনা পুরা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এবং তা এর অনুগামীদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।
আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, বিচার ও শাসনক্ষমতা একমাত্র তাঁরই এবং তিনিই হলেন শ্রেষ্ঠতম বিচারক। তিনি তাঁর শাসনক্ষমতায় কাউকে অংশীদার বানাতে নিষেধ

[illegible]

[illegible]:

فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (غافر: [illegible])

[illegible] ([illegible]: [illegible])

[illegible]:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (يوسف: [illegible])

[illegible] ([illegible]: [illegible])

[illegible]:

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (التين: [illegible])

[illegible]? ([illegible]: [illegible])

[illegible]:

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً (الكهف: [illegible])

[illegible] ([illegible]: [illegible])

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন :

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُــونَ وَمَنْ أَحْسَــنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمــاً لِقَــوْمٍ يُوقِنُونَ (المائدة: ٥٠)

অর্থাৎ তারা কি জাহেলিয়্যাত যুগের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য উত্তম ফয়সালাকারী কে হতে পারে ? (সূরা মায়েদা : ৫০)

আল্লাহ তাআলা সকল মাখলূকের স্রষ্টা। তাই তাদের জন্য কল্যাণ ও উপযোগী বিধিবিধান তিনিই ভালো জানেন। মানবসত্ত্বা সাধারণত জ্ঞানগরিমা, স্বভাব-চরিত্র ও অভ্যাসের দিক দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর হয়ে থাকে। তারা অন্যদের কল্যাণকর বিষয়াদি সম্পর্কে জানা তো দূরে থাক; স্বয়ং নিজেদের কল্যাণকর বিষয় সম্বন্ধেই অজ্ঞ। এজন্য যে সমাজ ও দেশে জনগণই সংবিধান ও আইন-কানুন প্রণয়ন করে সে দেশে দুর্নীতি, চারিত্রিক অবক্ষয় ও সামাজিক বিপর্যয় পরিদৃষ্ট হতে থাকে।

সাথে এটাও লক্ষ্যণীয় যে, অনেক দেশে এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাস্তবতাহীন এক বাহ্যিক অবয়ব ও শুধুই শ্লোগানে পরিণত হয়েছে, যদ্বারা মানুষকে ধোকা দেয়া হয়। বাস্তবিক অর্থে রাষ্ট্র পরিচালনা করে শুধুমাত্র ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদল। জনগণ এদের আদেশের সামনে নত ও পরাজিত থাকে। এ ব্যাপারে এর চেয়ে বড় দলীল আর কী হতে পারে যে, গণতন্ত্রের কোনো আইন যখন রাষ্ট্রের কর্ণধারদের অভিলাষের বিপরীত হয় তখন তাকে তারা পদদলিত করে পিষ্ট করে। নির্বাচনী জালিয়াতি, মানুষের স্বাধীনতাহরণ, সত্য ও ন্যায় প্রকাশকারীদের মুখবন্ধকরণের ঘটনাগুলো এমন কিছু বাস্তবতা, যা সবাই জানে। এটার জন্য কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নেই। মূলত দিন প্রমাণের জন্য

[illegible]

‘[illegible]’ [illegible]:

ديمقراطية نيابية :

أحد مظــاهر النظم الديمقراطية الــتي يمــارس فيها الشــعب مظاهر السيادة بواسطة مجلس منتخب من نواب من الشعب ، وفيها يحتفظ الشــعب بحق التــدخل المباشر لممارسة بعض مظاهر السيادة عن طريق وسائل مختلفة ، أهمها :

[illegible]. حق الاقتراع الشعبي : بـأن يقـوم عـدد من أفـراد الشـعب بوضع مشروع للقانون مجملاً أو مفصَّـلاً ، ثم يناقشه المجلس النيابي ويصوِّت عليه .

[illegible]. حق الاسـتفتاء الشـعبي : بـأن يُعـرض القـانون بعد إقـرار البرلمان له على الشعب ليقول كلمته فيه

[illegible]. حق الاعتراض الشعبي : وهو حق لعدد من الناخبين يحدده الدستور للاعتراض في خلال مدة معينة من صدوره ، ويــترتب على ذلك عرضه على الشـعب في اسـتفتاء عـام ، فـإن وافق عليه نُفِّذ....... وإلا بطل ، وبه تأخذ معظم الدساتير المعاصرة

(موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة: [illegible]/[illegible])

[illegible]:

[illegible]-

[illegible]. [illegible]: [illegible]

[illegible]

[illegible]

([illegible])

[illegible]

[illegible]:

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (يوسف: [illegible])

[illegible]

পথ, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (সূরা ইউসূফ : ৪০)

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন :
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ (الأنعام: ৫৭)
অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান দেয়ার ক্ষমতা নেই। (সূরা আনআম: ৫৭)

তৃতীয়ত :
অনেক মানুষ ধারণা করে, গণতন্ত্র মানেই স্বাধীনতা। কিন্তু এটা ভুল একটি ধারণা। যদিও গণতন্ত্রের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্যই হলো স্বাধীনতা। কিন্তু এখানে স্বাধীনতা বলতে বিশ্বাসগত স্বাধীনতা, চারিত্রিক অবক্ষয়ের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা উদ্দেশ্য। এগুলো ছাড়াও ইসলামী সমাজব্যবস্থায় এর অনেক অপকারিতা রয়েছে। এমনকি মত স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে বিষয়টি এতোদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, নবী - রাসূল, কুরআন ও সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারেও অপবাদ আরোপ ও সমালোচনা করা হচ্ছে। আর এ স্বাধীনতার দোহাই দিয়েই পর্দাহীনতা, অশ্লীলতা ও নৈতিকতা বিবর্জিত ছবি -সিনেমা সম্প্রচারের অনুমতি দেয়া হচ্ছে। এরকম আরো অনেক বিষয় রয়েছে, যার সবগুলোই নৈতিকতা ও ধর্মীয়ভাবে জাতির ধ্বংসের ব্যাপারে অবদান রাখছে।
তাছাড়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে স্বাধীনতার দাবি করে থাকে তাও ব্যাপকভাবে স্বীকৃত নয়। কেননা, আমরা এ স্বাধীনতাকে নিজ স্বার্থ ও সুবিধা অনুযায়ী সীমাবদ্ধ দেখি। যে সময়ে মত স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে মহানবী মুহাম্মাদ সা. এর ব্যাপারে সমালোচনা ও কটুক্তিকে গণতন্ত্র অনুমোদন করে থাকে ঠিক সে সময়েই ইয়াহুদীদের সাথে নাৎসিদের নৃশংসতা নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে এ স্বাধীনতা খর্ব হতে দেখি। শুধু তাই নয়; বরং এ নৃশংসতার কথা কেউ অস্বীকার করলে তার বিরূদ্ধে মামলা দায়ের ও

কারাবরণও করতে হয়। অথচ এটা এমন একটি ঐতিহাসিক বিষয়, যা অস্বীকার করা যায়।

এরা যদি স্বাধীনতারই দাবিদার হয়ে থাকে তাহলে কেনো মুসলিম সম্প্রদায়কে তাদের পথ ও ধর্ম বেছে নেয়ার সুযোগ দেয় না? কেনো তারা তাদের দেশে উপনিবেশ করে এবং তাদের ধর্ম ও বিশ্বাস পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় লেগে আছে? ইতালী কর্তৃক লিবিয়ার গণহত্যা, ফ্রান্স কর্তৃক আলজেরিয়ার গণহত্যা, ব্রিটিশ কর্তৃক মিশরের গণহত্যা ও আমেরিকা কর্তৃক আফগান ও ইরাকের গণহত্যার ব্যাপারে তাদের এ স্বাধীনতা কোথায় গেলো?

স্বাধীনতার দাবিদারদের নিকট কিছু বিষয়ের সাথে স্বাধীনতার অর্থ সাংঘর্ষিক হওয়ার আশঙ্কা থেকে বাঁচানোর জন্য কিছুটা সীমাবদ্ধ করার অবকাশ আছে। তন্মধ্য হতে কয়েকটি হলো:

১. আইন: সুতরাং সম্পূর্ণ স্বাধীন কোনো ব্যক্তির জন্য এ অধিকার নেই যে, রাস্তায় চলার বিপরীত দিক দিয়ে চলবে। অনুরূপ কারো এ অধিকারও নেই যে, লাইসেন্স ছাড়া কোনো দোকান খুলবে। যদি সে বলে, আমি তো স্বাধীন তথাপিও তার কথার প্রতি কেউ ভ্রুক্ষেপ করবে না।

২. সমাজ: সুতরাং উদাহরণ স্বরূপ তাদের দৃষ্টিতে একজন নারী গোসলের পোশাকে কোনো শোকাক্রান্ত বাড়ি যেতে পারে না। যদি সে বলে, আমি তো স্বাধীন একজন নারী তথাপি লোকজন তাকে হেয় প্রতিপন্ন করবে ও তাকে তাড়িয়ে দিবে। কারণ, এটা সামাজিকতা পরিপন্থী।

৩. স্বাভাবিক রুচি: সুতরাং তাদের কেউ উদাহরণ স্বরূপ মানুষের সামনে বায়ুবাতাস করতঃ খানা খেতে পারে না; এমনকি ঢেকুরও তুলতে পারে না। এতে মানুষ তাকে তুচ্ছ ও ইতর মনে করবে; যদিও সে বলে আমি তো স্বাধীন।

এ পর্যায়ে আমরা বলতে চাই: তাহলে আমাদের ধর্মের জন্যও কেনো কিছু সীমাবদ্ধতা তৈরী করা যাবে না? যেমন তাদের স্বাধীনতাকেও কিছু বিষয়ের সাথে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে, যা তারা অস্বীকার ও বিরোধিতা করতে পারে না। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, দীনের আনিত বিধিবিধানের মাঝেই রয়েছে মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ। অতএব নারীর পর্দাহীনভাবে বের হওয়া, মানুষের মদপান ও শুয়োরের গোশত ভক্ষণ ইত্যাদির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসবগুলোর মাঝেই মানুষের শরীর, বিবেক ও জীবনের জন্য কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে। কিন্তু ধর্মীয়ভাবে এ আদেশ হলে তারা স্বাধীনতার এ সীমাবদ্ধতা ও শৃঙ্খলকে ভেঙ্গে ফেলে। আর যদি আদেশটি তাদের মতোই কোনো মানুষের পক্ষ থেকে কিংবা আইনগতভাবে আসে তাহলে তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মানলাম!

চতুর্থত:
অনেকেরই ধারণা, ‘গণতন্ত্র’ শব্দটি ইসলামী ‘শুরা’ এর সমার্থক। কিন্তু অনেকগুলো কারণে এটা একটি ভ্রান্ত ধারণা। কতিপয় কারণ নিম্নরূপ:
১.শুরা বা পরামর্শ হয় শুধুমাত্র নিত্যনতুন সমসাময়িক বিষয়াদি এবং কুরআন-সুন্নাহয় যে বিষয়গুলোর বিশদ বিবরণ নেই সেগুলো নিয়ে। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দীনের অকাট্য প্রমাণিত বিধিবিধানেরও বিরোধিতা করে। অতএব সে নিষিদ্ধ বিষয়ের নিষেধাজ্ঞাকে উঠিয়ে দেয়, আল্লাহ তাআলা যেটা অনুমোদন বা আবশ্যক করেছেন তা নিষিদ্ধ করে দেয়। মদবিক্রির লাইসেন্স এ সংবিধানের দ্বারাই দেয়া হয়েছে। পতিতাবৃত্তি ও সুদী লেনদেনেরও একই অবস্থা। এ সংবিধানের দ্বারাই ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও আল্লাহর পথে আহবানকারীদের কর্মস্থল সংকীর্ণ করে দেয়া হচ্ছে। এতে শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিকতা সুস্পষ্ট। তাহলে এটা শুরা হয় কী করে?

২. শুরা মজলিস গঠিত হয় দীনের পাণ্ডিত্য, ইলম, বিবেক, মেধা, চরিত্র ইত্যাদি বিবেচনায় উত্তীর্ণ একদল যোগ্য লোকের সমন্বয়ে। অতএব এখানে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ও নির্বোধ শ্রেণীর সাথে পরামর্শ করার কোনো সুযোগ নেই; কাফের বা নাস্তিকদের ব্যাপার তো দূরে থাক! কিন্তু গণতান্ত্রিক পার্লামেন্ট বোর্ডে এগুলোর কোনো গুরুত্ব নেই। এজন্য এখানে একজন কাফের, নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ও নির্বোধও প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। ইসলামী শুরা ব্যবস্থার সাথে এর কতো ব্যবধান!

৩. শুরা মজলিস রাষ্ট্রপ্রধানকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করতে পারে না। প্রামাণ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে এবং অন্য সদস্যদের তুলনায় কারো মতকে অধিক সঠিক মনে করায় তিনি কখনো সদস্যদের একজনের মতকেও প্রাধান্য দিতে পারেন। এর বিপরীত সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের ঐক্যমত সমর্থিত সিদ্ধান্ত জাতির জন্য অবশ্য পালনীয় আইনে পরিণত হয়ে যায়।

যখন এটা জানা হলো তখন মুসলমানদের জন্য কর্তব্য হলো, স্বীয় দীনের উপর গর্ব করা, স্বীয় রবের বিধিবিধানের ব্যাপারে এ আস্থা রাখা যে, তা তাদের দীন ও দুনিয়াকে কল্যাণময় করবে এবং পাশাপাশি আল্লাহর শরীয়তবিরোধী সকল তন্ত্র থেকে মুক্ত থাকা। আর শাসক হোক বা শাসিত সকল মুসলমানের জন্য করণীয় হলো, জীবনের সকল অঙ্গনে আল্লাহর শরীয়তকে আঁকড়ে ধরবে। কারো জন্য এটা বৈধ নয় যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো মত বা পথকে নিজের জন্য গ্রহণ করবে। আর আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সা.-কে নবী হিসেবে মেনে সন্তুষ্ট থাকার দাবি হলো, মুসলমানেরা ইসলামকে প্রকাশ্যে ও আন্তরিকভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং আল্লাহর শরীয়তকে বড় মেনে রাসূল সা. এর সুন্নাহর অনুসরণ করে চলবে।

ইসলামি গণতন্ত্র : নিকৃষ্ট একটি পরিভাষা

গণতন্ত্র এবং ইসলামের হাকিকত সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ কারো অজানা নয় যে, গণতন্ত্র একটি কুফরি মতবাদ। কোনো মতবাদে একটি কুফর থাকলেই তা কুফরি মতবাদ হওয়ার জন্য যথেষ্ট; তাহলে যার ভিত্তিটাই কুফরের ওপর, সেটা কীভাবে ইসলামি হয়? নাম জামাতে ইসলামি, কিন্তু কাজ জামাতে কুফরির। ইসলামের নামে কুফরি লালন; এ কেমন ইসলাম!? ইসলাম আর গণতন্ত্র কখনো এক পাত্রে থাকতে পারে না। উভয়ের মধ্যে পূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান। ইসলাম ও গণতন্ত্র ভিন্নমুখী দুটি ধর্ম, সাংঘর্ষিক দুটি মতবাদ।

যেমন গণতন্ত্র বলে, জনগণই সকল ক্ষমতার অধিকারী। অথচ ইসলাম বলে, আল্লাহ হলেন সকল ক্ষমতার মালিক। গণতন্ত্র বলে, সার্বভৌমত্বের একমাত্র মালিক রাষ্ট্র বা সরকার। অথচ ইসলাম বলে, সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তাআলার। গণতন্ত্র বলে, রাষ্টের কোনো ধর্ম নেই, সব ধর্মকেই সে সমান বিশ্বাস ও সম্মান করে। অথচ ইসলাম বলে, ইসলাম ছাড়া সকল ধর্ম পরিত্যাজ্য। গণতন্ত্র বলে, অধিকাংশ জনপ্রতিনিধি চাইলে কোনো বৈধকে অবৈধ আর কোনো অবৈধকে বৈধ করতে পারে। অথচ ইসলাম বলে, আল্লাহর আইনের বিপরীত সমগ্র মানবজাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেলেও তা কোনোদিন বৈধ বা অবৈধ হয়ে যায় না। গণতন্ত্র বলে, আইন বানানোর অধিকার একমাত্র সাংসদদের। অথচ ইসলাম বলে, আইন প্রণয়নের একক অধিকার শুধু আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার। গণতন্ত্র বলে, পৃথিবীতে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠদের আইন-শাসন চলবে। অথচ ইসলাম বলে, জমিনে একমাত্র আল্লাহর আইন-শাসন চলবে। এভাবে বলতে গেলে আরও অনেক বৈপরিত্য দেখানো যাবে, যার একটিই যেকোনো মতবাদকে কুফরি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। তাই এটা যে কুফরি মতবাদ, এতে কারো সন্দেহ করার অবকাশ নেই।

دَعُوا عِنْدَ الِاحْتِجَاجِ تَسْمِيَةَ الرِّجَالِ؛ فَرُبَّ رَجُلٍ فِي الْإِسْلَامِ مَنَاقِبُهُ كَذَا وَكَذَا وَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنْهُ زَلَّةٌ، أَفَلِأَحَدٍ أَنْ يَحْتَجَّ بِهَا؟

[illegible]? ([illegible]: [illegible]/[illegible], [illegible] : [illegible], [illegible])

[illegible]. [illegible]:

مِنْهَا: أَنَّ زَلَّةَ الْعَالِمِ لَا يَصِحُّ اعْتِمَادُهَا مِنْ جِهَةٍ وَلَا الْأَخْذُ بِهَا تَقْلِيدًا لَهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمُخَالَفَةِ لِلشَّرْعِ، وَلِذَلِكَ عُدَّتْ زَلَّةً، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَتْ مُعْتَدًّا بِهَا؛ لَمْ يُجْعَلْ لَهَا هَذِهِ الرُّتْبَةُ، وَلَا نُسِبَ إِلَى صَاحِبِهَا الزَّلَلُ فِيهَا، كَمَا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُنْسَبَ صَاحِبُهَا إِلَى التَّقْصِيرِ، وَلَا أَنْ يشنع عليه بها، ولا ينتقص مِنْ أَجْلِهَا، أَوْ يُعْتَقَدُ فِيهِ الْإِقْدَامُ عَلَى الْمُخَالَفَةِ بَحْتًا، فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ خِلَافُ مَا تَقْتَضِي رُتْبَتُهُ فِي الدِّينِ.

“[illegible]” ([illegible]: [illegible]/[illegible]-[illegible], [illegible] : [illegible], [illegible])

[illegible]. [illegible] :

وَأَنَّ الْعَالِمَ قَدْ يَزِلُّ وَلَا بُدَّ؛ إِذْ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ، فَلَا يَجُوزُ قَبُولُ كُلِّ مَا يَقُولُهُ، وَيُنَزَّلُ قَوْلُهُ مَنْزِلَةَ قَوْلِ الْمَعْصُومِ؛ فَهَذَا الَّذِي ذَمَّهُ كُلُّ عَالِمٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، وَحَرَّمُوهُ، وَذَمُّوا أَهْلَهُ وَهُوَ أَصْلُ بَلَاءِ الْمُقَلِّدِينَ وَفِتْنَتِهِمْ، فَإِنَّهُمْ يُقَلِّدُونَ الْعَالِمَ فِيمَا زَلَّ فِيهِ وَفِيمَا لَمْ يَزِلَّ فِيهِ، وَلَيْسَ لَهُمْ تَمْيِيزٌ بَيْنَ ذَلِكَ، فَيَأْخُذُونَ الدِّينَ بِالْخَطَأِ - وَلَا بُدَّ - فَيَحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَيُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَيُشَرِّعُونَ مَا لَمْ يُشَرِّعْ، وَلَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ إِذْ كَانَتْ الْعِصْمَةُ مُنْتَفِيَةً عَمَّنْ قَلَّدُوهُ، وَالْخَطَأُ وَاقِعٌ مِنْهُ وَلَا بُدَّ..... وَقَالَ تَمِيمٌ

الدَّارِيِّ: اتَّقُوا زَلَّةَ الْعَالِمِ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ: مَا زَلَّةُ الْعَالِمِ؟ قُلْ: يَزِلُّ بِالنَّاسِ فَيُؤْخَذُ بِهِ، فَعَسَى أَنْ يَتُوبَ الْعَالِمُ وَالنَّاسُ يَأْخُذُونَ بِقَوْلِهِ.

“[illegible]” ([illegible] : [illegible]/[illegible]-[illegible] ([illegible])

[illegible]

[illegible]

[illegible]

غرض اسلام میں جمہوری سلطنت کوئی چیز نہیں.... یہ مخترعہ متعارفہ جمہوریت محض گھڑا ہوا ڈھکوسلہ ہے، بالخصوص ایسی جمہوری سلطنت جو مسلم و کافر ارکان سے مرکب ہو وہ توغیرمسلم سلطنت ہی ہوگی.

“[illegible] ....[illegible]” [illegible]

[illegible]

وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مزدور اور عوام کی حکومت ہے، ایسی حکومت بلاشبہ حکومت کافرہ ہے [illegible]

“[illegible] ([illegible])
[illegible]” [illegible] ([illegible])

[illegible]

ہمیں تو اسلام میں کہیں بھی مغربی جمہوریت نظر نہیں آئی اور اسلامی جمہوریت تو کوئی چیز ہی نہیں، معلوم نہیں اقبال مرحوم کو اسلام کی روح میں یہ جمہوریت کہاں سے نظر آگئی؟ جمہوریت ایک خاص تہذیب و تاریخ کا ثمرہ ہے، اسے اسلامی تاریخ میں ڈھونڈنا معذرت خواہی ہے.

“পশ্চিমা গণতন্ত্রের নমুনা ইসলামের কোথাও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। মূলত ইসলামি গণতন্ত্র বলতে কোনো জিনিসই নেই। জানি না, মরহুম ইকবাল ইসলামি আদর্শের মধ্যে এই গণতন্ত্র কোথায় পেলেন? গণতন্ত্র একটি বিশেষ ইতিহাস ও সভ্যতার ফল। ইসলামি ইতিহাসে তার অনুসন্ধান করাই অনর্থক।” দেখুন - মাসিক সানাবিল, করাচি : ৮/২৭-২৮, সংখ্যা : ১১, মে ২০১৩ ইং

৪. হাকিমুল ইসলাম কারি তাইয়েব রহ. বলেন:

یہ (جمہوریت) رب تعالی کی صفت ملکیت میں بھی شرک ہے اور صفت علم میں بھی شرک ہے۔

“এই গণতন্ত্র আল্লাহ তায়ালার রাজত্বেও শিরক এবং ইলমের মধ্যেও শিরক।” দেখুন - আদইয়ান কি জঙ্গ : ৫৪ (ইদারায়ে হিত্তিন, পাকিস্তান)

৫. মুফতি রশিদ আহমদ লুধইয়ানবি রহ.বলেন:

یہ تمام برگ وبار مغربی جمہوریت کے شجر ۂ خبیثہ کی پیداوار ہے۔ اسلام میں اس کافرانہ نظام کی کوئی گنجائش نہیں, نہ ہي اس طریقہ سے قیامت تك اسلامی نظام آسکتا ہیں.

“বিশ্বময় অস্থিতিশীল ও বিশৃঙ্খলাময় এ পরিবেশ পশ্চিমা গণতন্ত্রের নিকৃষ্ট বৃক্ষের ফসল। ইসলামে এ ধরনের কুফুরি ব্যবস্থাপনার কোনোই অবকাশ নেই। আর না এ পদ্ধতিতে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হতে পারবে।” দেখুন - আহসানুল ফাতাওয়া ৬/২৬ (এইচ. এম. সাঈদ. কোম্পানি, করাচি)

৬. মাওলানা ইউসুফ লুধইয়ানবি রহ. বলেন:

بعض غلط نظریات قبولیتِ عامہ کی ایسی سند حاصل کرلیتےہیں کہ بڑے بڑے عقلاء (اور عالم کہلانے والے بھی)اس قبولیتِ عامہ کے آگے سرڈال دیتے ہیں ،وہ یا تو ان غلطیوں کاادراک ہی نہیں کرپاتے یا اگر ان کو غلطی کااحساس ہوبھی جائے تو اس کے خلاف لب کشائی کی

جرأت نہیں کرسکتے۔ دنیا میں جو بڑی بڑی غلطیاں رائج ہیں، ان کے بارے میں اہل عقل اسی لئے المیہ کا شکار ہیں! اسی غلط قبولیتِ عامہ کا سکہ آج ’’جمہوریت‘‘ میں چل رہا ہے۔ جمہوریت دورِ جدید کا وہ ’’صنمِ اکبر‘‘ ہے جس کی پرستش اول اول دانایانِ مغرب نے شروع کی تھی، چونکہ وہ آسمانی ہدایت سے محروم تھے، اس لئے ان کی عقلِ نارسا نے دیگر نظام ہائے حکومت کے مقابلے میں جمہوریت کا بت تراش لیااور پھر اس کومثالی طرزِ حکومت قرار دے کر اس کا صور بلند آہنگی سے پھونکا کہ پوری دنیا میں اس کاغلغلہ بلند ہوا، یہاں تک کہ مسلمانوں نے بھی تقلیدِ مغرب میں جمہوریت کی مالا جپنی شروع کردی، کبھی یہ نعرہ بلند کیا گیا کہ ’’اسلام جمہوریت کا علم بردار ہے‘‘ اور کبھی ’’اسلامی جمہوریت‘‘ (جیسی خبیث اصطلاح) وضع کی گئی، حالانکہ مغرب ’’جمہوریت‘‘ کے جس بت کا پجاری ہے، اس کا نہ صرف یہ کہ اسلام سے کوئی تعلّق نہیں بلکہ وہ اسلام کے سیاسی نظریہ کی ضد ہے، اس لئے اسلام کے ساتھ جمہوریت (یا اس کی اصطلاحات) کا پیوند لگانا اور جمہوریت کو مشرف بہ اسلام کرناصریحاً غلط ہے۔

পশ্চিমাদের তালেতালে তাদের গুণগান গাওয়া শুরু করল। কখনো তো এ দাবিও করল যে, ইসলাম হল গণতন্ত্রের পতাকা বাহক। আবার কখনো ইসলামি গণতন্ত্র জাতীয় জঘণ্য পরিভাষা তৈরি করল। অথচ পশ্চিমাবিশ্ব যে গণতন্ত্রের পুজারি, ইসলামের সাথে তা কেবল সম্পর্কহীনই নয়; বরং তা ইসলামি রাজনৈতিক ও শাসনব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিকও বটে। এজন্য ইসলামের সাথে গণতন্ত্র বা তার পরিভাষাগুলো মিলানো এবং গণতন্ত্রকে ইসলামের সাথে মিশ্রিত করা স্পষ্ট ভুল।” দেখুন - আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল: ৭/৬৫৭, (মাকতাবা লুধিয়ানবি, করাচি)

৭. মুফতি মাহমুদ রহ. বলেন:

م جموریت پر لعنت بھیجت یں۔ اس میں تو دو مردوں کی آپس میں شادی کی اجازت ۔ جیسا ک برطانی ن اس کا بل کثرتِ رائ س پاس کیا۔

“আমরা গণতন্ত্রের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করি। এ তন্ত্রে তো পুরুষদের পরস্পরে সমকামী বিবাহের বৈধতা রয়েছে। যেমন ব্রিটেনে অধিকাংশের ভোটে এর পক্ষে বিল পাশ হয়েছে।”

৮. মাওলানা আশেকে ইলাহি বুলন্দশহরি রহ. বলেন:

ان کی لائی وئی جموریت بالکل جالان جموریت ہے جس کا اسلام س کوئی تعلق نیں۔

“এদের আনিত গণতন্ত্র সম্পূর্ণ মূর্খতামূলক একটি ব্যবস্থাপনা, ইসলামের সাথে যার কোনোই সম্পর্ক নেই।” দেখুন - তাফসিরে আনওয়ারুল বয়ান: ১/৫১৮

৯. মুফতি নিযামুদ্দিন শামযায়ি শহিদ রহ. বলেন:

جیسا کہ پیشاب کے ذریعہ کبھی وضو نہیں ہو سکتا اور جیسا کہ نجاست کے ذریعہ سے کبھی طہارت اور پاکی حاصل نہیں کی جاسکتی اسی طرح سے لادینی اورمغربی جمہوریت کے ذریعہ سے کبھی اسلام غالب نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا میں جب بھی اسلام غالب ہوگا تو اس کاواحد راستہ وہی ہوگا جوراستہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلي اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا اور وہ جہادکاراستہ ہے جس کے ذریعہ سے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب ہوگا

“[illegible]” [illegible]

[illegible]

مغربی جمہوریت جسکی بنیاد "عوام کی حکمرانی" کے تصور پر ہے ، اسلام کے قطعی خلاف ہے ، کیونکہ اسلام کی بنیاد "الله کی حاکمیت اعلی" کے عقیدہ پر ہے جسے قرآن کریم نے "إن الحكم إلا لله" کے مختصر جملہ میں ارشاد فرمایا ہے ، لہذا مغربی جمہوریت کو اپنے تمام تصورات کے ساتھ برحق سمجھنا عصر حاضر کی بدترین گمراہیوں میں سے ہے.

“[illegible] إن الحكم إلا لله [illegible]”

হক মনে করা বর্তমান যুগের জঘণ্যতম ভ্রান্তিগুলোর অন্যতম ” দেখুন - ফাতাওয়ায়ে উসমানি : ৩/৫০৭,(মাকতাবা মাআরিফুল কুরআন , করাচি)

আকাবির হযরতের ফতোয়া আরও আছে, কিন্তু এখানে সব বিস্তারিতাকারে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। যতটুকু বর্ণনা করলাম , সত্যাগ্রহী পাঠকদের জন্য যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ। যারা এরপরও মানতে চাইবে না , তাদের জন্য মূলত হাজার দলিল পেশ করেও কোনো লাভ হবে না। আজ এতটুকুই। আল্লাহ আমাদের সত্য উপলব্ধি করার তাওফিক দিন।

গণতন্ত্র , নির্বাচন ও ভোট নিয়ে কিছু সংশয় ও তার নিরসন :

বর্তমান সময়ে অন্ধকার এতটাই ছেয়ে গেছে যে , শত্রু -মিত্র চেনা বড় দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলো -অন্ধকারের প্রভেদ বুঝা মুশকিল হয়ে গেছে , সত্য -মিথ্যার ব্যবধান জানা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। কত দিকে নজর দেবো , সর্বত্রই তো জখম ! ইদানীং যে বিষয়টি নিয়ে অনেকেই পেরেশান , সেটা হলো নির্বাচন ও ভোট। এ নিয়ে সমাজে চলছে চরম প্রান্তিকতার খেলা। ছোট-বড় অনেকেই এতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যাচ্ছেন। তাদের জন্যই আজকের এ প্রবন্ধ। আশা করি , পুরোটা পড়লে সব দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যাবে। এ প্রবন্ধে মোট আটটি সংশয় ও তার নিরসন নিয়ে আলোচনা করেছি। আজ এতটুকুই , কাল আরও আসছে ইনশাআল্লাহ।

১ নং সংশয় : দুই খারাপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খারাপটি অবলম্বন।
ফিকহের একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি হলো -
إِذَا اُبْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ أَهْوَنَهُمَا، وَيَدْفَعُ أَعْظَمَ الضَّرَرَيْنِ بِأَهْوَنِ الضَّرَرَيْنِ.

‘যখন দুটি সমস্যা একসাথে দেখা দেবে তখন দুটির মধ্য হতে অপেক্ষাকৃত সহজটা গ্রহণ করবে এবং এ ক্ষেত্রে দুই ক্ষতির মধ্যে সহজটাকে নিয়ে কঠিনটাকে বর্জন করা হবে।’ (শরহুস সিয়ারিল কাবির: ৫/৪৭, প্রকাশনী: দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরূত)

তো এ মূলনীতির আলোকে বলা যায় যে, গণতন্ত্র ইসলামে নিষিদ্ধ হলেও যেহেতু এতে অংশগ্রহণ না করলে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা হয় না। এছাড়া এতে অংশগ্রহণ না করলে সরকার ব্যবস্থায় নাস্তিক ও বদদ্বীন লোকদের একক আধিপত্য কায়েম হয়ে যাবে, যা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য খুবই ভয়ানক ও ক্ষতিকর একটি বিষয়। তাই এ বৃহৎ স্বার্থকে সামনে রেখে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে শরয়ি কোনো বাধা নেই।

নিরসন:
গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সমর্থকরা ইসলামের এ নীতিকে দুভাবে ব্যবহার করে থাকে। এক: যে প্রার্থীর নীতি-আদর্শ অপেক্ষাকৃত কম ইসলাম বিরোধী তাকে ভোট দেওয়ার মানে হলো কম খারাপের পক্ষ নেওয়া। দুই: অন্যদিকে কাউকে যদি ভোট না দেওয়া হয় তাহলে বেশি খারাপ প্রার্থীটি নির্বাচিত হতে পারে এই আশঙ্কায় কম খারাপ লোকটিকে ভোট দেওয়া। আসলে ইসলামের বেশিরভাগ নীতি নিয়ে এভাবেই মানুষ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তারা সঠিক নীতিটি সুন্দরভাবে উল্লেখ করে, কিন্তু এর ভুল প্রয়োগ করে। অথবা এমন ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করতে চায়, যেখানে ঐ নীতি আদৌ প্রযোজ্য নয়। যেমন এ নীতিটিকে তারা ভুল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে। প্রথমত, উসুলবিদদের মতে এটা শুধুমাত্র সেখানেই প্রয়োগ করা যাবে, যেখানে দুটি পথের একটি গ্রহণ না করে উপায় নেই। কিন্তু যদি এগুলো থেকে বেঁচে থাকার কোনো উপায় থাকে অর্থাৎ দুটি পথের একটি গ্রহণ করতে বাধ্য না হয়, সেখানে এ নীতি প্রযোজ্য নয়। সুতরাং

কাউকে যদি দুটি হারামের একটি গ্রহণে বাধ্য করা হয় তাহলে সে কম গুনাহের কাজটি করতে পারে। কিন্তু যেখানে কেউ বাধ্য করছে না সেখানে এটা প্রযোজ্য হবে না।
যেমন মওসুআতুল কাওয়ায়িদিল ফিকহিয়্যাতে এ মূলনীতির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে :

إذا ابتلي إنسان ببليتين ولا بد من ارتكاب إحداهما فللضرورة جاز ذلك

‘মানুষ যখন একসাথে দুটি সমস্যায় নিপতিত হয় এবং তাকে সে দুটির কোনো একটি বাধ্যতামূলক করতেই হবে এমন পরিস্থিতি হয়, তখন প্রয়োজনবশত তার জন্য তা বৈধ হয়ে যাবে।’ (মওসুআতুল কাওয়ায়িদিল ফিকহিয়্যা : ১/২৩০, প্রকাশনী : মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত)

ভোটের ক্ষেত্রে এ মূলনীতি প্রয়োগের দৃষ্টান্ত এরূপ যে, কোনো ব্যক্তি একজন মুসলিম ভাইকে মদ খাওয়ার দাওয়াত দিল। সেখানে একটি মদে থাকবে ৫০% অ্যালকোহল এবং অন্য একটি মদে থাকবে ২৫% অ্যালকোহল। সুতরাং সে দাওয়াত গ্রহণ করে ২৫% অ্যালকোহলের মদটি পান করল। বিষয়টি এমন নয় কি? না, বিষয়টি শুধু এতটুকুই নয়; বরং এর চেয়েও ভয়ংকর। কারণ, মদপান তো হারাম। আর গণতন্ত্রের বিষয়টি কুফর।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে আমাদেরকে কেউ বাধ্য করছে না। তাই কম খারাপকে সমর্থনের নামে একটি শিরক/কুফরি ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমরা ভোট না দিলে যে ক্ষতি হবে তার তুলনায় এই শিরক (আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আইন প্রনয়ণের অধিকার দেওয়া) অনেক অনেক বেশি ক্ষতিকর। আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। কোনো একটি নাইট ক্লাব। রাতে জমজমাট আড্ডা হয়। নারী-পুরুষ একসাথে সব রকমের নোংরামিতে লিপ্ত হয়। কিন্তু এর টিকিট সংখ্যা মাত্র একশটি। কোনো এক বুজুর্গ ভাবল, আমি একটা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ثُمَّ الْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مَنْ ابْتَلَى بِبَلِيَّتَيْنِ وَهُمَا مُتَسَاوِيَتَانِ يَأْخُذُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ وَإِنْ اخْتَلَفَا يَخْتَارُ أَهْوَنَهُمَا؛ لِأَنَّ مُبَاشَرَةَ الْحَرَامِ لَا تَجُوزُ إلَّا لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ فِي حَقِّ الزِّيَادَةِ

[illegible]

প্রয়োজন নেই। (তাবয়িনুল হাকায়িক : ১/৯৮, প্রকাশনী : আল মাতবাআতুল কুবরা , কায়রো)

২ নং সংশয় : ক্ষতি এড়িয়ে সুবিধা গ্রহণ করার নীতি অবলম্বন।

যদিও গনতন্ত্র হারাম , তথাপি এতে অংশগ্রহণ করার মধ্যে অনেক লাভ রয়েছে। এর মাধ্যমে পুরোপুরি না হলেও ক্ষেত্র বিশেষে আংশিকভাবে তো ইসলামের প্রচার -প্রসার বাড়ে এবং উপকার হয়। তাছাড়া মুসলিমদের জন্য অন্য নেতাদের থেকে তুলনামূলক কম ক্ষতিকর একজন ইসলামপন্থী নেতাকে নির্বাচিত করে ইসলামবিরোধী শক্তিকে পরাজিত করলে যতটা লাভ হবে তা এই হারামের ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশি। তাই এ বিবেচনায় গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করা কেন জায়েজ হবে না ?

নিরসন :

প্রথমেই বলতে হয় , গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা হারাম নয় ; বরং শিরক বা কুফর। সুতরাং এর সুবিধা আলোচনা করে একে উৎসাহিত করা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহর তাওহিদকে উপেক্ষা ও অমান্য করে কুফরি তন্ত্রের মাধ্যমে সুবিধা আদায় করার কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং এ ধরনের অজুহাত ও যুক্তি অগ্রহণযোগ্য এবং এর দ্বারা মুসলিমদের ভোটদানে উৎসাহিত করা সম্পূর্ণরূপে ভুল।

দ্বিতীয়ত , যদি গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সত্যিকার অর্থে কোনো সুবিধা পাওয়া গেলেও এটি হালাল হয়ে যাবে না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

‘তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, উভয়টির মধ্যে রয়েছে মহাপাপ ও মানুষের জন্য উপকারিতা। তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বেশি।’ (সুরা বাকারা : ২১৯)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মদের মধ্যে কিছু উপকারিতা আছে বললেও এটাকে তিনি হারাম করেছেন। তাই কোথাও কোনো লাভ বা উপকারিতা দেখলেই তা ইসলামের নামে বৈধ হয়ে যায় না। বরং দেখতে হবে, এখানে শরিয়তের অন্য কোনো বাধা ও নিষেধাজ্ঞা আছে কিনা। যেখানে আল্লাহর নাফরমানি ও শরিয়তের বিরোধিতা পাওয়া যাবে, সেখানে যত উপকারিতাই নিহিত থাকুক না কেন, কস্মিনকালেও তা বৈধ হবে না।

ফুকাহায়ে কিরাম উপরিউক্ত আয়াত থেকে এ মূলনীতি বের করেছে :

دَرْءَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

‘কল্যাণ ও উপকারিতা অর্জনের তুলনায় অবৈধ বিষয়াদি দূরকরণই অগ্রগণ্য।’ (আল কাওয়ায়িদুল ফিকহিয়্যা ওয়া তাতবিকাতুহা ফিল মাজাহিব : ১/২৩৮ (দারুল ফিকর, দামিশক)

সুতরাং তাদের দাবি অনুসারে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের কিছু সুবিধা বা লাভ থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু এতে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর পরিবর্তে মানুষকে আইনদাতা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করাটা দ্বীনের জন্য যে কোনো লাভের চাইতে অনেক অনেকগুণ বেশি ক্ষতিকর। আর একথা আমরা স্পষ্টভাবে বলতে পারি যে, শিরক হলো মদ খাওয়া বা জুয়া খেলার চাইতে অনেক বড় গুনাহ। তাছাড়া এর পরিণতিও মারাত্মক পর্যায়ের ভয়াবহ। তাই কোনো অবস্থাতেই সামান্য কিছু সুবিধার জন্য মানবরচিত এমন কুফরি মতবাদে অংশগ্রহণ করা বৈধ হতে পারে না।

৩ নং সংশয় : ‘সকল আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল’ এ নীতি অবলম্বন।

হাদিসে এসেছে, ‘সকল আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।’ এ ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, আমরা তো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে নির্বাচন করছি না; বরং এর মাধ্যমে সাধ্যমতো ইসলাম কায়েমের চেষ্টা এবং মুসলিমদেরকে জুলুম নির্যাতন থেকে রক্ষা করাই উদ্দেশ্য। যেহেতু একটি সৎ উদ্দেশ্যে, ভালো নিয়তে এ কাজটি করা হচ্ছে তাই এতে কোনো সমস্যা নেই; বরং এটি প্রশংসনীয় একটি ব্যাপার। তাই এ নিয়তের ভিত্তিতে এমনটা করা জায়েজ হওয়া চাই।

নিরসন :
প্রথম কথা হলো, নিয়ত ভালো থাকলে সবকিছু জায়েজ হয়ে যায়, এটা তো ইসলামবিরোধী একটি কথা। অসংখ্য উদাহরণ আছে, যেথায় হাজারো ভালো নিয়ত করলেও তা জায়েজ হবে না। উলামায়ে কিরামের নিকট প্রসিদ্ধ একটি নীতি হলো, الغاية لا تـــبرر الوســـيلة ‘লক্ষ্য মাধ্যমকে পবিত্র ও নির্দোষ করতে পারে না।’
সুতরাং লক্ষ্য ও নিয়ত ভালো হলেই যে কোনো পন্থা অবলম্বন করাকে ইসলাম কখনো অনুমোদন করে না। এখানে দেখতে হবে, লক্ষ্য কী এবং মাধ্যম কী? মাধ্যম যদি কুফরি হয়, তাহলে লক্ষ্য যত মহানই হোক না কেন, সে মাধ্যম গ্রহণ করার সুযোগ নেই। হ্যাঁ, যদি বাধ্য হয় তাহলে ভিন্ন কথা। নতুবা কিছু ফায়েদার আশায় কুফরি কাজে অংশগ্রহণ করাও কুফরি।
দ্বিতীয়ত, উত্তম নিয়ত থাকলেই গুনাহ উত্তম আমল বা সওয়াবের কাজ হয়ে যায় না। ইমাম গাজ্জালি রহ. বলেন :
فهي ثلاثة أقسام معاص وطاعات ومباحات القسم الأول المعاصي وهي لا تتغير عن موضعها بالنية فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات فيظن أن المعصية تَنْقَلِبُ طَاعَةً بِالنِّيَّةِ كَالَّذِي يَغْتَابُ إِنْسَانًا

مُرَاعَاةً لقلب غَيْرِهِ أَوْ يُطْعِمُ فَقِيرًا مِنْ مَالِ غَيْرِهِ أو يبني مدرسة أو مسجداً أو رباطاً بِمَالٍ حَرَامٍ وَقَصْدُهُ الْخَيْرُ فَهَذَا كُلُّهُ جَهْلٌ وَالنِّيَّةُ لَا تُؤَثِّرُ فِي إِخْرَاجِهِ عَنْ كَوْنِهِ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا وَمَعْصِيَةً بَلْ قَصْدُهُ الْخَيْرَ بِالشَّرِّ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى الشَّرْعِ شَرٌّ آخَرُ فَإِنْ عَرَفَهُ فَهُوَ مُعَانِدٌ لِلشَّرْعِ وَإِنْ جَهِلَهُ فَهُوَ عَاصٍ بِجَهْلِهِ إِذْ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

তাই হতো, তাহলে মুসলিমদের জন্য বাইবেল আর মূর্তি বিক্রয় করে অভাবী মুসলিদেরকে সাহায্য করাও জায়েজ হয়ে যেত।

তৃতীয়ত, কোনো কাজ বৈধ হওয়া না হওয়া নির্ভর করে শরিয়তে এর অনুমোদন আছে কিনা- এর ওপর। নিয়তের কার্যকারিতা ঐ সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে কাজটি প্রথম থেকেই শরিয়া অনুমোদিত ছিল। এরপর তাতে নিয়তের তারতম্যের কারণে তা মুবাহ, সাওয়াব বা গোনাগের কাজে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং গণতন্ত্রের মতো এমন জঘন্য একটি কুফরকে নিয়তের মাসআলার সাথে গুলিয়ে ফেলা চরম নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে।

৪ নং সংশয়: ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ-এ ভিত্তিতে গণতন্ত্র।

শরিয়তের অন্যতম একটি বিধান হলো, ভালো কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজের নিষেধ করা। সুতরাং এ ভিত্তিতে গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করাতে তো কোনো সমস্যা নেই; বরং এতে বিভিন্ন মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার সুযোগ থাকায় তা উত্তম ও প্রশংসনীয় কাজ বলে গণ্য হওয়া চাই।

নিরসন:
যারা নির্বাচনের মাধ্যমে ভালো কাজের আদেশ ও খারাপ কাজের নিষেধ করা হয় বলে দাবি করে এবং তুলনামূলক ভালো প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে তুলনামূলক খারাপ প্রার্থীকে বাধা দেওয়া হয় বলে গলাবাজি করে তাদেরকে আমরা বলব, গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণই হলো শিরক। আর তাই এটাকেই সর্বপ্রথম নিষেধ করতে হবে। গণতন্ত্রের মাধমে মানুষ আইন রচনার জন্য আল্লাহ তাআলার পাশে অন্যকে স্থাপন করে, যা সুস্পষ্ট শিরক। তারা এই নীতিটিকে যেভাবে ব্যবহার করছে, তা সম্পূর্ণ উল্টো এবং তা প্রকৃতপক্ষে তাদেরই বিরুদ্ধে যায়। তাছাড়া ভালো কাজের আদেশ ও খারাপ

[illegible]

فَإِذَا كَانَ إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ يَسْتَلْزِمُ مَا هُوَ أَنْكَرُ مِنْهُ وَأَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ لَا يَسُوغُ إِنْكَارُهُ.

[illegible]

[illegible]

[illegible] :

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

[illegible]

[illegible]

[illegible] :

قَالَ تَعَالَى: {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ}. أَيْ أَنَّ الْقَتْلَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ شَرٌّ وَفَسَادٌ فَفِي فِتْنَةِ الْكُفَّارِ مِنْ الشَّرِّ وَالْفَسَادِ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ.

[illegible]

তার চেয়েও অধিক গুরুতর পাপ ও অমঙ্গল রয়েছে । (মাজমুউল ফাতাওয়া: ২৮/৩৫৫, প্রকাশনী: মাজমাউল মালিক ফাহাদ, সৌদিআরব)

সুতরাং এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের অজুহাতে শিরক করা যাবে না। তাতে অত্যাচার যতই কমে যাবার সম্ভাবনা থাকুক, তাতে কিছুই যায় আসে না। কারণ, মুসলিমরা অত্যাচারের কারণে যে ক্ষতির স্বীকার হয়েছে শিরক করার মাধ্যমে তার চেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হবে ।

৫ নং সংশয়: ‘নিতান্ত প্রয়োজনে হারাম গ্রহণের অনুমতি’ এ ভিত্তিতে গণতন্ত্র।

ইসলামি ফিকহের অন্যতম একটি মূলনীতি হলো, ‘নিতান্ত প্রয়োজন অবৈধ কাজকে অনুমোদন দান করে।’ এ যুক্তিতে গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ ভ্রান্তি কিভাবে হয়?

নিরসন:
যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ হারাম বলে মনে করেন তারা অজুহাত দেন যে, এখন মুসলমানদের জন্য একটি জরুরি অবস্থা বিরাজ করছে। সুতরাং এমতাবস্থায় হারাম কাজে অংশগ্রহণ করাকে ইসলাম সমর্থন করে। অর্থাৎ যে জিনিসটি হারাম ছিল, তা এই প্রেক্ষাপটে বা পরিস্থিতিতে হালাল।
এ মূলনীতির ক্ষেত্রে কয়েকটি দিক বিবেচনা করা উচিত ছিল, যা তারা করেননি। কারণ, এ নীতিটি সর্বক্ষেত্রে সর্বজনীনভাবে প্রয়োগ করার মতো নয়; বরং এ ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম আছে এবং কিছু বাধ্যবাধকতা বা সীমা আছে, যার কারণে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই নীতির ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথমত, কারও জিনা করা বা কোনো মাহরাম মহিলাকে নিকাহ করার অজুহাত কখনো এটা হতে পারে না যে, আমার যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা আবশ্যকীয় হয়ে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

أَنَّ الْمُحَرَّمَاتِ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا مَا يَقْطَعُ بِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يُبِحْ مِنْهُ شَيْئًا لَا لِضَرُورَةِ وَلَا لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ: كَالشِّرَكِ وَالْفَوَاحِشِ وَالْقَوْلِ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ. وَالظُّلْمِ الْمَحْضِ وَهِيَ الْأَرْبَعَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْله تَعَالَى {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ}. فَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ مُحَرَّمَةٌ فِي جَمِيعِ الشَّرَائِعِ وَبِتَحْرِيمِهَا بَعَثَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ وَلَمْ يُبِحْ مِنْهَا شَيْئًا قَطُّ وَلَا فِي حَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ

[illegible]

জানো না।” এ চারটি বিষয় সকল আসমানি শরিয়তেই হারাম। আল্লাহ তাআলা সকল নবী-রাসুলকে এগুলোর নিষেধাজ্ঞা দিয়েই প্রেরণ করেছেন। এগুলোর কোনোটিকে কখনো কোনো অবস্থায়ই হালাল করেননি। (মাজমুউল ফাতাওয়া: ১৪/৪৭০, প্রকাশনী: মাজমাউল মালিক ফাহাদ, সৌদিআরব)

৬ নং সংশয়: শুরা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তো একই জিনিস।

ইসলামে যেমন শুরাব্যবস্থা আছে, গণতন্ত্রেও তেমনি নির্বাচনব্যবস্থা আছে। তাহলে এটা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হবে কেন? অতএব গঠনগত দিক থেকে কিছু পার্থক্য থাকলেও উভয়টি যেহেতু মৌলিকভাবে এক ও অভিন্ন, বিধায় এটাকে ইসলাম পরিপন্থী বলা যাবে না।

নিরসন:
আধুনিক সময়ের বহুল আলোচিত একটি ভ্রান্তির নাম হলো, ‘ইসলামি গণতন্ত্র’। অনেক ইসলামি দল আজ মানবরচিত গণতন্ত্রের আদর্শ দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তারা ইসলামি শুরার সাথে এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন গণতন্ত্রের সামঞ্জস্য প্রমাণ করতে চায়। এ ধরনের দলের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো মিশরের ‘ইখওয়ানুল মুসলিমিন’ এবং ভারত উপমহাদেশের ‘জামাতে ইসলামি’। অধুনা আরেকটি দলের আবির্ভাব ঘটেছে ‘ইসলামি শাসনতন্ত্র’ নামে। একসময় ইখওয়ান-জামাত প্রচার করত যে, তারা গন্তব্যে পোঁছার জন্য সাময়িকভাবে গণতন্ত্রকে ব্যবহার করছে। যদিও আজ গণতন্ত্রই তাদের গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় তারা দীর্ঘসময় ধরে বিভিন্নভাবে গণতন্ত্র নামক কুফুরি ও শিরকি আদর্শকে ইসলাম প্রমাণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। গণতন্ত্রকে ইসলাম প্রমাণ করার জন্য কিছু খোঁড়া যুক্তি ব্যবহার করা হয়। তন্মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত ও

প্রসিদ্ধ যুক্তি হলো, গণতন্ত্র আর ইসলামি শুরা দুটো একই বিষয়।
শুরা ইসলামের মৌলিক নীতিগুলোর অন্যতম একটি নীতি। এমনকি পবিত্র কুরআনে কারিমে এই নামে একটি সুরাও আছে। কিন্তু ইসলামি শরিয়ার শুরা আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে শুরার কথা বলা হয়, উভয়ের মাঝে অনেক ব্যবধান আছে। গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ আছে। কিছু স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত। আবার কিছু সমতার সাথে সম্পর্কিত। এমন আরও কিছু রূপ আছে। এজন্যই দেখা যায়, গণতন্ত্র ব্যক্তি জীবনের সাথে সম্পর্কিত নয়। অর্থাৎ গণতন্ত্রে ব্যক্তিজীবন নিয়ে তেমন একটা মাথা ঘামানো হয় না।

যদি কোনো দেশে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র প্রয়োগ করা হয় তাহলে এর অর্থ হলো, যে কেউ পরস্পারিক সম্মতির ভিত্তিতে সমকামিতা, লিঙ্গ পরিবর্তন এবং জিনায় লিপ্ত হওয়ার অধিকার রাখে। অথবা কেউ আত্মহত্যাও করতে পারে, যতক্ষণ না সে কারও ক্ষতির কারণ হচ্ছে। এটা হলো ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, যেখানে গণতন্ত্রের কোনো হস্তক্ষেপ নেই। গণতন্ত্র একটি সামাজিক ব্যবস্থা, যা ব্যক্তিজীবনকে শামিল করে না। সুতরাং পাশ্চাত্যের এই গণতন্ত্র ব্যক্তির জীবনের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

অন্যদিকে শুরার বিষয়টি হলো, শরিয়ত অনেক বিষয়ের ফয়সালা পূর্বেই করে দিয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়কে নির্দিষ্ট জায়গায় স্থাপন করেছে। এ বিষয়গুলো সবসময় একই অবস্থায় অনড় ও অবিচল থাকবে। এর কোনো পরিবর্তন হবে না। এরপর সেই টেবিলে নির্দিষ্ট কিছু জায়গা খালি করে দিয়েছে এবং বলেছে, এগুলো তোমরা তোমাদের মধ্যে শুরার দ্বারা নির্ধারিত করবে।

শরিয়াহ অনেকগুলো বিধান স্থাপন করে দিয়েছে এবং নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এগুলো হলো ইসলামের স্তম্ভ, যার ওপর ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে। কেউ এগুলো

অপসারণ করতে পারবে না। আর শরিয়াহ নির্ধারিত বিষয়গুলোর বাহিরে যা আছে, তা খলিফা নিজ সিদ্ধান্তে বা শুরার সাথে পরামর্শ করে নির্ধারন করতে পারবে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা আদেশ দিয়েছেন, ‘আর কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো। অতপর যখন সংকল্প করবে...।’ তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেন, ‘আল্লাহ ও তার রাসুল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ইমানদার পুরুষ ও নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই।’

আল্লাহর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোনো পরামর্শ বা শুরার সুযোগ নেই। যেসব বিষয় আল্লাহ তাআলার বিধান হিসাবে বর্ণিত হয়নি সেগুলো মানুষের সাধারণ বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত। এগুলো আইনের বিভিন্ন ধারার সাথে সম্পর্কিত। যেমন সমাজনীতি, পৌরনীতি, ভ্রমণ, ভিসা, পাসপোর্ট ও ট্রাফিক আইন ইত্যাদি। এগুলো আইনের এমন শাখা, যেগুলোর ব্যাপারে মানুষ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এ বিষয়গুলোই মানুষের মাঝে শুরার মাধ্যমে হবে, যদি না তা শরিয়ার কোনো মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হয়।

শুরা হলো খলিফা নির্ধারণ ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর জন্য নির্বাচিত একশ্রেণীর বিজ্ঞ সভাসদ, যাদেরকে ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ বলা হয়। তারা ইলম ও আখলাকে প্রসিদ্ধ। মানুষের মধ্যে নেতৃস্থানীয়। সম্মানী, দায়িত্বশীল ও ক্ষমতাসম্পন্ন। ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ এর গুণাবলী প্রসিদ্ধ। তারা হবেন শরিয়তের বিদ্বান, শ্রেষ্ঠ, মুত্তাকি ও বিচক্ষণতাসম্পন্ন আলিম। আর তাদের বিচক্ষণতা সাব্যস্ত হবে তাদের ইলমি অবস্থান ও শরিয়ার আলোকে। নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন, ভোটার আইডি কার্ড, বার্থ সার্টিফিকেট, পুলিশ ভেরিফিকেশন এসবের ভিত্তিতে নয়।

পদ্ধতি ও দর্শনের দিক থেকে এই দুয়ের মাঝে মৌলিক পার্থক্য আছে। গণতন্ত্রের নির্দিষ্ট কোনো

রেফারেন্স নেই। পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের ইচ্ছার ওপর এর মূল্যবোধ নির্ভরশীল। আর শুরা প্রতিষ্ঠিত হয় কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামের সুসাব্যস্ত নীতির ওপর। সুস্পষ্ট নসের বিপরীত না হয়ে শরয়ি দলিল দ্বারা সাব্যস্ত ও বিশুদ্ধ ইজতিহাদই হলো শুরার ভিত্তি। গণতন্ত্রের ভিত্তি হলো, জনগণের নির্ধারনই চূড়ান্ত নির্ধারন। চাই তা অন্যান্য মতবাদের সাথে সাংঘর্ষিক হোক না কেন। আর শুরার কথা হলো, নিরঙ্কুশ রাজত্ব কেবল আল্লাহর জন্যই। তিনি যা ইচ্ছা তাই ফয়সালা করেন। তার সৃষ্টি তারই বিধানমতো চলবে। গণতন্ত্র সকল মানুষের মাঝে সমান অধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করে। কোনো প্রকার পার্থক্য করার নীতিমালা নেই। আর শুরা পরিশুদ্ধি ও বিচক্ষণতার বিবেচনায় দেশের পণ্ডিত ও ধর্মীয় নেতাদের এবং অগ্রদূতদের অগ্রাধিকার দেওয়ার মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং গণতন্ত্রের সাথে শুরার সমতার দাবি একটি গুরুতর ভুল ও ফিকহি নীতিমালার বিপরীত।

৭ নং সংশয়: গণতন্ত্রও একটি স্বতন্ত্র ধর্ম?

বাংলাদেশ জামাতে ইসলামির সাবেক আমির অধ্যাপক গোলাম আজম সাহেবের নিকট একটি সেমিনারে প্রশ্ন করা হয়- আপনি কুফরি মতবাদ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোনো বক্তৃতা দেন না কেন? উত্তরে তিনি বলেন, ‘গণতন্ত্র কুফরি মতবাদ’ এভাবে পাইকারিভাবে বলা মোটেই ঠিক নয়। গণতন্ত্র মানে সহজে এটুকু যে, জনগণের নির্বাচনে সরকার গঠিত হবে। কেউ গায়ের জোরে এসে গদিতে বসতে পারবে না। দেশের জনগণের রায় নিয়ে ক্ষমতায় বসতে হবে। আবার সরকার পরিবর্তনও হবে জনগণের রায় অনুযায়ী। এটাই হচ্ছে গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে আরও একটি বিষয় হচ্ছে, একবার তাদেরকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় দেওয়ার পর তারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে, কোনো প্রতিবাদ করা যাবে না বা বাধা দেওয়া যাবে না, তা নয়; বরং বাধা দেওয়া হবে, প্রতিবাদ করা হবে। তাদের

দোষত্রুটি ধরে দেওয়া হবে। এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের পরিচয়। এর সঙ্গে ইসলামের কোনো বিরোধ নেই। ইসলামের বিরোধ হচ্ছে এই পয়েন্টে যে, সার্বভৌমত্ব কার হাতে? আমরা বলি আল্লাহর হাতে। আর গণতন্ত্র বলে জনগণের হাতে। গণতন্ত্রের বাকি তিনটা পয়েন্টে ইসলামের সাথে কোনো বিরোধ নেই। সুতরাং ‘গণতন্ত্র কুফরি’ এত বড় ফতোয়া এই বয়সেই দিয়ে ফেলা উচিত নয়। গণতন্ত্রের শুধু ‘সার্বভৌমত্ব হবে জনগণের’ এ অংশটুকুই কুফরি।

নিরসন:
এখানে একটি সাংঘর্ষিক বিষয়ের অবতারণা হয়েছে। ইসলামের ব্যাপারে সাধারণ নলেজ রাখা ব্যক্তিও জানে, কোনো মতবাদ কুফরি হওয়ার জন্য ঐ মতবাদের সকল কিছুই কুফরি হওয়া জরুরি নয়। যেমন কাদিয়ানি, শিয়া ইসনা আশারাদের সকল কিছুই যে কুফর বিষয়টি এমনটি নয়; বরং সেখানেও অনেক বিষয় আছে, যার সাথে ইসলামের বিরোধ নেই। তাই বলে সেসব মতবাদ সামগ্রিকভাবে ইসলামি হয়ে যাবে না। অতএব গণতন্ত্রের যে কোনো একটি অংশ কুফরি হওয়াই এটি কুফর সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট। ঠিক যেমন একটি কুফরে লিপ্ত হওয়াই কাফির হওয়ার জন্য যথেষ্ট। মরহুম অধ্যাপক সাহেব নিজেই বলেছেন, গণতন্ত্রের একটি দিক কুফর। আবার তিনিই বলেন, গণতন্ত্রকে কুফরি মতবাদ বলা যাবে না!!!
আমরা তো বলি, গণতন্ত্রের শুধু একটি দিকই নয়; বরং গণতন্ত্রের মূলনীতি পুরোটাই কুফরের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের সাথে এর মৌলিক কোনো সামঞ্জস্য নেই এবং খ্রিস্টবাদ, সনাতন ধর্ম বা বৌদ্ধধর্মের ন্যায় গণতন্ত্রও একটি ধর্ম!!!

গণতন্ত্রকে হুট করে কুফরি বলে দেওয়া যাবে না, বিষয়টি তা নয়; বরং গণতন্ত্রও একটি ধর্ম। দুনিয়াতে বিভিন্ন পার্লামেন্ট আছে। তারা আইন তৈরি করে। কিন্তু সেগুলো সব একচেটিয়া আইন। যেমন টেক্স বাড়াতে হলে বাড়াও, বিদ্যুত বিল

বাড়াতে হলে বাড়াও। কেন বাড়াতে হবে, কী সমস্যার কারণে বাড়াতে হবে? তারা এসব দেখানোর কোনো প্রয়োজন মনে করে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এমন কোনো আইন বা বিধান নাযিল করেননি, যে আইনের দ্বারা কারও কোনো ক্ষতি হবে; বরং আল্লাহ তাআলার আইন দ্বারা সকলেই শান্তি পাবে। বাদশাহ আকবর ‘দ্বীনে ইলাহি’ নামে একটি ধর্ম তৈরি করেছিল। এই ধর্ম প্রবর্তন করে সে ঘোষণা দিয়েছিল যে, সকল হিন্দু ও মুসলিমকে ধর্মীয়ভাবে এক করা হবে। পরবর্তী কালে এই ধর্মের দ্বারা মুসলমানদের হিন্দু বানানো হয়েছে। সে নিজেও বেইমান হয়ে মূর্তিপূঁজক হয়ে গিয়েছে। তো সে তার প্রবর্তিত এই পদ্ধতিকে ‘ধর্ম’ নাম দিয়েছে বিধায় মানুষ তা সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করেনি। কারণ, সকলেই জানত যে, মুসলমানদের ধর্ম তো ইসলাম। এই দ্বীনে ইলাহি নিশ্চয়ই নতুন কোনো ভ্রান্ত ধর্ম। অবশেষে তার এই ধর্মের মুকাবেলায় মুজাদ্দিদে আলফে সানি রহ. শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে তা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এমনিভাবে পশ্চিমা গণতন্ত্রের ধারক বাহকেরা যখন দেখল যে, বাদশাহ আকবর তার প্রবর্তিত নীতিকে ধর্ম নাম দেওয়ার কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে তখন তারা অত্যন্ত ধূর্ততা ও চতুরতার সাথে তাদের এই নবউদ্ভাবিত সংবিধানের নাম ধর্ম দেয়নি। তারা এর নাম দিল গণতন্ত্র। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের এই গণতন্ত্র একটি পরিপূর্ণ ধর্ম। ইসলাম ধর্মের অনেক পরিভাষা গণতন্ত্রের মধ্যে ভিন্ন নামে ব্যবহৃত হয়। ইসলামে যাকে ‘ফরজ’ বলে গণতন্ত্র সেটাকে বলে ‘ডিউটি’। ইসলাম বলে ‘জায়েজ’ ও ‘হারাম’ আর গণতন্ত্র বলে ‘আইনসম্মত’ ও ‘আইনবিরোধী’। প্রকৃতপক্ষে মূল বিষয় একই। পরিভাষার ক্ষেত্রে কিছু শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে। ইসলাম যেমন একটি স্বতন্ত্র ধর্ম, তার নিজস্ব কিছু পরিভাষা আছে, তেমনই গণতন্ত্র একটি স্বতন্ত্র ধর্ম, তারও কিছু পরিভাষা আছে। এই ‘গণতন্ত্র’ ধর্মের খোদা বা প্রভু হলো যারা আমেরিকার কর্ণধার তারা।

সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী হলো এই ধর্মের ফেরেশতা।

শরিয়তের যেমন আইন রয়েছে, গণতন্ত্রেরও তেমন আইন রয়েছে। কেউ যদি শরিয়া ছেড়ে দেয়, তাহলে তাকে বলা হয় মুরতাদ। তার শাস্তি হলো, তাকে হত্যা করতে হবে। গণতন্ত্রেরও একই বিধান। কোনো ব্যক্তি বা দেশ যদি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তখন তারাও তাকে রাষ্ট্রদোহী বলে। তার শাস্তি হলো হত্যা। ইসলাম ত্যাগকারীর শাস্তিও হত্যা এবং গণতন্ত্র ত্যাগকারীর শাস্তিও হত্যা। যেমন পাকিস্তানের উত্তর প্রদেশ, কাশ্মীরসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমনই করা হচ্ছে। পাকিস্তানের জামিআ হাফসা (একটি মহিলা মাদ্রাসা) ও লাল মসজিদের ওপর সেনাবাহিনীর বর্বর আক্রমণ হয়। সেখানে অবস্থানরত ছাত্রীদেরকে এবং মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকে গুলি করে শহিদ করে দেওয়া হয়। তাদের অপরাধ ছিল তারা গণতন্ত্রকে অস্বীকার করেছে।

এই মানবরচিত ধর্মের দ্বারা এত পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে, যার কোনো সীমা নেই। এর মাধ্যমে আমেরিকা তাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও সিলেবাস সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছে। আর তাদের সেই চাতুর্যপূর্ণ সিলেবাসের মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়াতে এই ধর্মের উম্মত ও অনুসারী বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা সহজেই এটাকে মেনে নিয়েছে। তাদের মনে এমন কোনো প্রশ্নও জাগে না যে, এটা মানলে আমার ইসলাম কোথায় থাকবে? অথচ কেউ যদি এই গণতন্ত্রকে মানে তাহলে তার ইমান থাকে না। এটি মানলে কুরআনের আয়াতকে অস্বীকার করতে হয়। রাজনৈতিক দর্শনের মাধ্যমে তারা এমন জঘন্য থিউরি পেশ করেছে মানুষের সামনে, যা মানলে মানুষ নিজেকে মুসলমান ভাববে ঠিক, কিন্তু আসলে সে কাফির হয়ে যাবে। এই মানবরচিত সবগুলো মতবাদের একই অবস্থা। যেমন সমাজতন্ত্র মানলেও কাফির হতে হয়। সেখানে

ব্যক্তি মালিকানা বলতে কিছু নেই। সকল সম্পদের মালিক সরকার। আর যদি সব কিছুর মালিক সরকারই হয় তাহলে হজ কার ওপর ফরজ হবে ? জাকাত কার ওপর ফরজ হবে ? মসজিদ মাদরাসা ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা কার দায়িত্ব হবে ? কারও তো ব্যক্তি মালিকানায় কোনো সম্পদ নেই। প্রকৃতপক্ষে তাদের এই একটি নীতির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা একজন ব্যক্তিকে যত আর্থিক ইবাদতের সুযোগ দিয়েছেন, সবই নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

এই গণতন্ত্র কুফরিতন্ত্র হওয়ার জন্য অসংখ্য স্পষ্ট প্রমাণাদি আছে। এতে বলা হয়েছে, জনগণই ক্ষমতার উৎস। এটা কুরআনের অসংখ্য আয়াতের বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ

অর্থাৎ আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমতা দান করেন। আবার যার কাছ থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন। (সুরা আলে ইমরান : ২৬)

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতে। যেহেতু তিনি ইচ্ছা হলে কাউকে ক্ষমতা দান করেন আবার ইচ্ছা হলে ছিনিয়ে নেন। তাহলে সকল ক্ষমতা তার জন্য হওয়াটাই স্বাভাবিক। জনগণের হাতে তো কিছুই নেই। অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

অর্থাৎ সকল শক্তি ও ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। (সুরা বাকারা : ১৬৫)

কীভাবে জনগণ ক্ষমতার উৎস হয় ?! একটি প্রাকৃতিক দূর্যোগ হলে লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা মারা যায়। কেউ তো কিছুই করতে পারে না। অতএব গণতন্ত্রে সকল ক্ষমতার উৎস জনগণকে মানার সাথে সাথে এই আয়াতগুলোকে অস্বীকার করা হলো।

গণতন্ত্র বলে, আইন বানানোর অধিকার হচ্ছে পার্লামেন্টের। অথচ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, ‘আইন বানানোর অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার।’ আইন প্রণয়ন তো দূরের কথা তাদের দায়িত্ব হলো, তারা আল্লাহর আইন যথাযথভাবে দেশে বাস্তবায়ন করবে। তারা আইন তৈরি করার কোনো অধিকার রাখে না। কোনো নবি-রাসুল পর্যন্ত আইন তৈরি করার অধিকার পাননি। ওষুধে যেমন আবরণ দিয়ে ভেতরে তিতা ওষুধ সেবন করানো হয়, সে জানে না যে, কতটা তিতা ওষুধ তাকে পান করানো হয়েছে। ঠিক ওরাও গণতন্ত্রকে ধর্মের নাম না দিয়ে স্বাভাবিক একটি নাম দিয়েছে। কারণ, এই নামটা দিলে সবাই তাদের কুটকৌশল বুঝে যাবে।

কুরআন বলে সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ তাআলা। আর গণতন্ত্র বলে, সার্বভৌমত্বের মালিক জণগণ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আসলে আকাশ ও জমিনের সকল কিছু আল্লাহ তআলার।’ গণতন্ত্র মনে করে, পার্লামেন্টের যে কোনো আইন তৈরি করার অধিকার আছে। এখানে চ্যালেঞ্জ করার কারও অধিকার নেই। কারণ, তারা সর্বোচ্চ ক্ষমতা রাখে। যে কোনো ধরনের আইন তারা বাস্তবায়িত করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি যা কিছু করব তাতে কোনো মাখলুকের আপত্তি করার অধিকার নেই। যে করবে সে বেইমান হবে। কিন্তু তোমরা যা করবে তার জবাবদিহি করতে হবে।’ আল্লাহ তাআলার এই ঘোষণার পর একথা কীভাবে বলা যায় যে, পার্লামেন্টকে কোন জবাবদিহি করা লাগবে না, যা মনে চায় তা-ই আইন করবে!!!

হে জাতি, নিজেই এখন নিজের ইমান রক্ষা করুন। কারণ, কবরে কোনো পীর, পয়গম্বর সাহায্য করতে পারবে না। যদি দুনিয়াতেই ইমান নষ্ট করে যাই তাহলে পরকালে কেউই আমাদের সাহায্য করতে পারবে না। কবরে ইমানের পরীক্ষা হবে।

পরিশেষে বলব, গণতন্ত্র কুফরি ধর্ম হওয়ার জন্য এর চেয়ে বেশি প্রমাণের আর প্রয়োজন নেই।।

কুরআনের সাথে সামান্য সংঘর্ষশীল কোনো কিছু বললে বা মানলে যেখানে ইমান থাকে না, সেখানে এই গণতন্ত্রের মধ্যে তো কুরআনের অসংখ্য আয়াতকে অস্বীকার করা হয়েছে। এটাকে ধর্ম বলে নাম না দেওয়ার কারণে, আলাদা কোনো উপাসনালয় না থাকার কারণে আজ মানুষ একে ধর্ম বলে বুঝতে পারছে না। ইসলাম রাজতন্ত্রকেও সমর্থন করে না। অথচ সেই রাজতন্ত্র এর চেয়ে বহুগুণ ভালো। সেটাকে কুফরিতন্ত্রও বলা হয়নি। সেখানে কুরআনের আইন দিয়ে বিচারকার্য পরিচালিত হয়। তাই বুঝা গেল, গণতন্ত্র বাকি অন্যান্য মানবরচিত ধর্মের তুলনায় অধিক ভয়ংকর। আর নিঃসন্দেহে এটি একটি স্বতন্ত্র কুফরি ধর্ম।

৮ নং সংশয়: ইসলাম ও গণতন্ত্রের মৌলিক পার্থক্য।

ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে তো উল্লেখযোগ্য মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। তাহলে এ দুটিকে পরস্পরে সাংঘর্ষিক বলা হয় কেন?

নিরসন:
এটা ভুল ধারণা যে, ইসলাম ও গণতন্ত্রের মাঝে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। মূলত এদুভয়ের মাঝে অনেক পার্থক্য আছে, যা সুস্পষ্ট কুরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী। নিম্নে ইসলাম ও গণতন্ত্রের কিছু মৌলিক পার্থক্য উল্লেখ করা হলো:
১. ইসলামের মূলভিত্তি আল্লাহর অভিপ্রায়। আর গণতন্ত্রের মূলভিত্তি জনমত।

২. আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম। আর সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণের নাম গণতন্ত্র।

৩. ইসলাম বলে, সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ। আর গণতন্ত্র বলে, সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ।

৪. ইসলাম বলে, সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ। আর গণতন্ত্র বলে, সার্বভৌমত্বের মালিক জনগণ

৫. ইসলাম বলে, আল্লাহ প্রদত্ত সংবিধানেই রয়েছে মানবতার মুক্তি। আর গণতন্ত্র বলে, মানবরচিত সংবিধানেই রয়েছে মানবতার মুক্তি

৬. ইসলাম বলে, মানুষ হিসেব সকলেই সাধারণভাবে এসব অধিকার ভোগ করবে। কিন্তু যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও তাকওয়ার ভিত্তিতে গুণীজনেরা বিশেষভাবে মূল্যায়িত। আর গণতন্ত্র বলে, মতপ্রকাশে, ভোটদানে ও নির্বাচনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত।

৭. ইসলাম বলে, উত্তরাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী পুরুষে প্রভেদ বিদ্যমান। আর গণতন্ত্র বলে, উত্তরাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী পুরুষ উভয়ই সমান বিবেচিত।

৮. ইসলাম বলে, শক্তি ও মেধায় তারতম্যের কারণে নারী ও সংখ্যালঘুরা সংরক্ষণ নীতির অধীনে ভোগ করবে বিশেষ অধিকার। আর গণতন্ত্র বলে, নারী ও সংখ্যালঘুরা সাধারণ সমাধিকার ভোগ করবে।

৯. ইসলাম বলে, শাশ্বত আদর্শ ও নৈতিক মানসম্পন্ন পরমত ইসলামে বর্জনীয়। আর গণতন্ত্র বলে, পরমত সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের এক বিশেষ আদর্শ। নৈতিকতার কোনো বালাই নেই গণতন্ত্রে। যেমন, অবাধ যৌনতা বা সমকামিতা কোনো মতামতকেই বর্জন করতে বাধ্য নয় গণতন্ত্র।

১০. ইসলাম বলে, শাশ্বত বা প্রত্যাদিষ্ট বিধান সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন ছাড়াই বৈধ। আর গণতন্ত্র বলে, যে কোনো আইন সংখ্যাগরিষ্ঠ বা তাদের প্রতিনিধি কর্তৃক সমর্থিত হতে হবে।

১১. ইসলাম বলে, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই চেতনা পরিব্যপ্ত, এই অর্থে প্রগতি। আর গণতন্ত্র বলে, জাগতিক উন্নয়নেই সকল চেতনা সীমিত, এই অর্থে প্রগতি।

১২. ইসলাম বলে, চূড়ান্ত ও বাস্তবিক জবাবদিহিমূলক সরকার পদ্ধতি। আর গণতন্ত্র বলে, নামকা ওয়াস্তে জবাবদিহিমূলক সরকার পদ্ধতি।

১৩. ইসলাম বলে, আল্লাহপ্রদত্ত আইন দ্বারা বিচারকার্য নিয়ন্ত্রিত। আর গণতন্ত্র বলে, মানবরচিত আইন দ্বারা বিচারকার্য নিয়ন্ত্রিত।

১৪. ইসলাম বলে, ঐশী বিধান কর্তৃক মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত। আর গণতন্ত্র বলে, সংবিধান কর্তৃক মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত।

১৫. ইসলাম বলে, জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহর ইচ্ছর প্রতিফলন ঘটানোই ইসলামি মূল্যবোধের পরিচায়ক। আর গণতন্ত্র বলে, জীবনের সর্বস্তরে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচায়ক।

১৬. ইসলামি বিশ্বাসে মানুষের প্রথম উপাধি খলিফা/প্রতিনিধি। কাজেই ইসলাম ও রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য। গণতান্ত্রিক বিশ্বাসে ধর্ম ও রাষ্ট্র দুটি আলাদা।

১৭. ইসলামের সংবিধান হলো আল্লাহ প্রদত্ত আল কুরআন। গণতন্ত্রের সংবিধান হলো মানবরচিত কুফরি মতবাদ।

১৮. ইসলামে মদকে হারাম করা হয়েছে। গণতন্ত্রে মদের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে।

১৯. ইসলাম বলে, সকল বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। আর গণতন্ত্র বলে, বিধান দেওয়ার অধিকার জনগণের।

২০. ইসলাম সুদকে হারাম করেছে। গণতন্ত্র সুদকে হালাল করেছে।

২১. ইসলাম পর্দাকে ফরজ করেছে। গণতন্ত্রে পর্দার জন্য কাউকে বাধ্য করা যাবে না।

২২. ইসলাম জিনা-ব্যাভিচার হারাম করেছে।
গণতন্ত্র পতিতালয়ের লাইসেন্স দিয়েছে।

২৩. ইসলামে চোরের হাত কাটার বিধান দেওয়া হয়েছে।
গণতন্ত্র এই বিধানকে বর্বর আইন বলে ঘোষণা করেছে।

২৪. আল্লাহ তাআলাকে মান্য করার নাম ইসলাম।
অধিকাংশ মানুষের ভোটের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দেওয়ার নাম গণতন্ত্র ।

২৫. ইসলাম বলে, আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ না করলে ইসলামের ভিত্তিই নষ্ট হয়ে যায়,মানুষ মুসলিম থাকে না। কিন্তু গণতন্ত্রে কেউ আল্লাহকে মান্য করুক বা না করুক, গণতন্ত্রের গোলামিতে কোনো পার্থক্য হবে না।

২৬. ইসলাম বলে, সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগরিষ্ঠের কোনো স্থান নেই। একমাত্র হক ও সত্যই বাস্তবায়িত হয়। আর গণতন্ত্র বলে, হক ও সত্যের কোনো স্থান নেই। অধিকাংশ জনগণের চাহিদাই বাস্তবায়িত হয়।

২৭. ইসলামের মধ্যে হক সেটাই, যা আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছেন, এছাড়া বাকি সব বাতিল। চাই অধিকাংশ জনগণের ফয়সালাই হোক না কেন। আর গণতন্ত্রে বাস্তবিক সত্য মিথ্যার কোনো পার্থক্য নেই। সত্য সেটাই, যা অধিকাংশ মানুষ বলেছে।

২৮. ইসলাম বলে, সেই ব্যক্তিই আমির ও শাসক হবেন, যিনি নিজে ইসলাম পালন করবেন এবং অন্যদরেকেও ইসলামের অনুসারী বানাবেন। আর গণতন্ত্রে সেই ব্যক্তিই আমির ও শাসক হবে, যে বেশি ভোট পাবে। চাই সে সমাজের নিকৃষ্টতম অপরাধীই হোক না কেন।

কেন গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম সম্ভব নয় ?

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ،

وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ جَاحِدًا لَهَا يَكُونُ مُرْتَدًّا، وَكَذَا الزَّكَاةُ وَالصَّوْمُ وَالْحَجُّ؛ لأِنَّهَا مِنَ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ. وَأَمَّا تَارِكُ الصَّلاَةِ كَسَلاً فَفِي حُكْمِهِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: يُقْتَل رِدَّةً، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْل سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَأَبِي عَمْرٍو، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَحَكَاهُ الطَّحَاوِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ نَفْسِهِ، وَحَكَاهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ

الصَّحَابَةِ. وَالْقَوْل الثَّانِي: يُقْتَل حَدًّا لاَ كُفْرًا، وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. وَالْقَوْل الثَّالِثُ: أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ كَسَلاً يَكُونُ فَاسِقًا وَيُحْبَسُ حَتَّى يُصَلِّيَ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

[illegible]

[illegible]

গণতন্ত্র কতোটুকু সফল হবে? ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এক জরিপে দেখা গেছে, দেশের মাত্র ২% মানুষ নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। তাহলে আপনি কি করে আশা করেন যে, তারা নামাজ কায়েমের এ ধরনের বিধানের পক্ষে ভোট দেবে?! আর তাদের ভোটে ইসলামি বিধান বাস্তবায়িত হবে?! এটা আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র।

বস্তুত গণতন্ত্রবাদী কোনো একটি ইসলামি দল যদি ভাগ্যক্রমে ক্ষমতায় চলেও আসে তবুও তারা কখনোই ইসলামি বিধানানুসারে নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে না। কেননা, এতে পরের নির্বাচনে তাদের ভরাডুবির আশংকা আছে।

এ বিষয়টি আরও একটু পরিষ্কার করে বলি। যদি কোনো রাষ্ট্রের শতভাগ মুসলিম নামাজ পড়ে তবুও আমরা ঐ রাষ্ট্রকে ইসলামি রাষ্ট্র বলব না, যদি না সেখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে বেনামাজির শাস্তির বিধান থাকে। কিন্তু যে রাষ্ট্রে বেনামাজির শাস্তির বিধান আছে, চাই সে রাষ্ট্রের সবাই নামাজ নাও পড়ুক, তবুও সেটা ইসলামি রাষ্ট্র। বস্তুত ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার কারণেই এই বিভ্রান্তিগুলো ছড়াচ্ছে। কেউ কেউ তো এমনটিও মনে করে যে, তাদের দল পার্লামেন্টের ১৫১টি আসন পেলেই বুঝি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে!!!

দ্বিতীয় কারণ:

ইসলাম নামক মুক্তির বিহঙ্গ আজ জাতীয়তাবাদ নামক লোহার খাঁচায় বন্দী। মুসলিমদের সীসাঢালা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আজ আমেরিকা, ব্রিটেনের এঁকে দেওয়া সীমারেখায় কেঁদে কেঁদে মরছে। গণতন্ত্র

[illegible]

[illegible] :

[illegible]

[illegible]:

عَنْ ابْن عَبَّاسٍ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

[illegible]

[illegible] :

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ فِي الْمُرْتَدِّ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الإِسْلَامِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: تُقْتَلُ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: تُحْبَسُ وَلاَ تُقْتَلُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

قَالَ الْمُخَصِّصُونَ بِالْجِزْيَةِ لِأَهْلِ الْكِتَابِ: الْمُرَادُ مِنْ إِرْسَالِ الرُّسُلِ وَإِنْزَالِ الْكُتُبِ إِعْدَامُ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ مِنَ الْأَرْضِ وَأَنْ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} [البقرة: 193] ، وَفِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: {وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال: 39] ، وَمُقْتَضَى هَذَا أَلَّا يُقَرَّ كَافِرٌ عَلَى كُفْرِهِ، وَلَكِنْ جَاءَ النَّصُّ بِإِقْرَارِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا أَعْطَوُا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، فَاقْتَصَرْنَا بِهَا عَلَيْهِمْ وَأَخَذْنَا فِي عُمُومِ الْكُفَّارِ بِالنُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى قِتَالِهِمْ إِلَى أَنْ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ.

[illegible]

প্রতিষ্ঠিত হয়।’ [সুরা আনফাল: ৩৯] এ আয়াতের দাবি হলো, কোনো কাফিরকেই তার কুফরির উপর থাকতে দেওয়া যাবে না। কিন্তু অন্য আয়াতে আহলে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রিস্টানরা অবনত মস্তকে বশ্যতা স্বীকার করে জিজিয়া দিলে সেক্ষেত্রে তাদেরকে অব্যহতি দেওয়ার কথা এসেছে। অতএব, আমরা শুধু তাদের ব্যাপারেই ক্ষান্ত থাকব। আর অন্যান্য কাফেরদের ব্যাপারে ঐ আয়াত গ্রহণ করব, যেখানে সামগ্রিকভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে। (আহকামু আহলিজ জিম্মা: ১/৯৫, প্রকাশনী: রামাদি, দাম্মাম)

অতএব, যারা ঠুনকো কারণে-অকারণে মার্কিন, চিন বা ভারতীয় দূতাবাসে ধরনা দেয়, তারা এ জিজিয়া ব্যবস্থা চালু করার সাহস দেখাবে বলে আপনার মনে হয়? কুফফারদের ফর্মুলা অনুসরণ করে তাদের স্বার্থবিরোধী আইনের স্বপ্ন দেখা কি নিছক বিভ্রান্তি নয়?

পঞ্চম কারণ:

ইসলামি রাষ্ট্র ইসলাম বিরোধী সকল প্রকার বাতিল মতবাদ, মানবরচিত তন্ত্রমন্ত্র ও দলকে নিষিদ্ধ করছে; চাই তারা বামপন্থী হোক, সেক্যুলার হোক, কিংবা জাতীয়তাবাদী হোক। তাদেরকে তাওবা করার আহবান জানানো হবে। তাওবা করলে তারা মুক্ত; অন্যথায় তাদেরকে মুরতাদ ঘোষণা করে হত্যা করা হবে।

শুধু তাই নয়, ইসলামি শরিয়ায় ‘সরকারি দল’ এবং ‘বিরোধী দল’ এসব পরিভাষা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য। ইসলামে সকল প্রকার দলাদলি নিষিদ্ধ। এক আমিরের নেতৃত্বে গোটা উম্মাহ পরিচালিত হবে। এটাই হলো ইসলামি ব্যবস্থা। বহুদলীয় গণতন্ত্র স্বীকার করে নিয়ে এ কাজ করার সুযোগ কোথায়?

জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় এসে তাদেরই প্রিয় নাস্তিক বুদ্ধিজীবী, ইসলামবিরোধী কবি- সাহিত্যিককে হত্যা করার নৈতিক শক্তি একটি ইসলামি দল কোথায় পাবে? রাজনৈতিক দলসমূহকে নিষিদ্ধ করতে গেলে কার্যত গণতন্ত্রকেই কবর চাপা দিতে হবে। যে জনগণের কাছ থেকে ভোটভিক্ষার মাধ্যমে দলটি ক্ষমতায় এসেছে তারা এটা মানবে কেন? ঐ সমস্ত দল বা তাদের সাপোর্টাররাই বা বসে থাকবে কেন? আর পশ্চিমারাই বা বসে বসে আঙুল চুষবে কেন?

ষষ্ঠ কারণ:

একটি ইসলামি রাষ্ট্র সকল প্রকার অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, যত্রতত্র বেপর্দা চলাফেরা, নারী- পুরুষের অবাধ মেলামেশা, সহশিক্ষা, অশ্লীল নাটক, সিনেমা, যাত্রাপালা নিষিদ্ধ করবে। সিনেমা হল, নাইটক্লাব, মদের বার, ডিজে পার্টি, নিষিদ্ধ গানের আসর বন্ধ করবে। সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে ফেলবে। ইসলামি মূল্যবোধ বিরোধী পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, ব্লগ, সাময়িকী, বইপত্র, কবিতা, উপন্যাস, সাহিত্য নিষিদ্ধ করবে। বিবাহিত ব্যভিচারীকে রজম (প্রস্তরাঘাত করে হত্যা) করবে। সমকামীদের দৃষ্টান্তমূলক চরম শাস্তি বা প্রয়োজনবোধে হত্যা করবে। চারুকলা- কারুকলার নামে নিষিদ্ধ মূর্তি-ভাস্কর্য তৈরির চর্চা বন্ধ করবে। গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত সরকারের এসব করার সুযোগ কোথায়?

আপনি যদি ক্ষমতায় যেতে চান তাহলে আপনাকে জনপ্রিয়তা খুঁজতে হবে। আর আপনি যদি জনপ্রিয়তা খুঁজতে চান, তাহলে রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা আপনার নিজের মাঝেই ইসলাম থাকবে না। আসলে জনপ্রিয়তার রাজনীতিই আজকের ইসলামি দলসমূহের আদর্শিক অধঃপতনের প্রধান কারণ।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন:

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ.

[illegible]

[illegible] :

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ- وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا.

[illegible]

[illegible]

[illegible] :

[illegible]

অষ্টম কারণ :

মিশর কিংবা আলজেরিয়ার মতো পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য দরকার পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণ। গণতন্ত্রবাদীদের এসব পরিস্থিত সামাল দেওয়ার প্রস্তুতি কতটুকু ? তাদের প্রস্তুতি তো কেবল পোস্টারিং আর দেয়াল লিখন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। বরং তারা এ ধরনের প্রস্তুতিকে অসাংবিধানিক ও অনিয়মতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে থাকে। অথচ আলিমদের পরিষ্কার মত হলো , সার্বক্ষণিক জিহাদের প্রস্তুতি মুসলিমদের জন্য ফরজ ; চাই যুদ্ধের পরিস্থিতি থাকুক আর নাই থাকুক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন :

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ.

অর্থাৎ তোমরা কাফেরদের মোকাবেলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সদা সজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে। (সুরা আনফাল : ৬০)

তিনি আরো বলেন :

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً.

অর্থাৎ কাফিররা কামনা করে, যেন তোমরা অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাব সম্পর্কে অসতর্ক ও উদাসীন হও। যাতে তারা তোমাদের উপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। (সুরা নিসা : ১০২)

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ، وَيَكْفِيكُمُ اللهُ، فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ.

অর্থাৎ উকবা বিন আমের র . থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা .-কে বলতে শুনেছি , তোমাদের হাতে সত্ত্বরই অনেক রাষ্ট্র বিজিত হবে

এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যথেষ্ঠ হবে। এতদসত্বেও তোমাদের কেউ যেন তিরন্দাজি ভুলে না বসে। (সহিহ মুসলিম: ৩/১৫২২, হা. নং ১৯১৮, প্রকাশনী: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত)

মূলত গণতন্ত্র হলো কাফেরদের তৈরি একটি ফাঁদ। যখন তারা দেখবে, একটি ইসলামি দল ক্ষমতায় চলে এসেছে তখন তারা মিথ্যা অভিযোগে তাদের উপর সন্ত্রাসী হামলা চালাবে এবং তখনও তারা গণতন্ত্র রক্ষারই অজুহাত দেবে। ইতিহাসে এর অনেক প্রমাণ আছে।

গনতন্ত্র নিয়ে আক্ষেপ করতে গিয়ে একজন বিশেষজ্ঞ একবার বলেছিলেন:

‘গনতন্ত্র এমন একটা ধর্ম, যা তার অনুসারীদের বেঁধে দেয়। এমনকি বুলেটের আঘাতে তোমাদের বুক ঝাঁঝরা করে দিলেও তোমরা সর্বোচ্চ রাস্তায় গিয়ে একটু প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। আর এতটুকু করতে পারলেই তারা এই ভেবে পরিতৃপ্ত হয়ে যায় যে, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় হয়ে গিয়েছে!’

নবম কারণ:

আমেরিকার র্যাইন্ড ইনস্টিটিউশন মডারেট মুসলিমদের যে চারটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছে এবং যেগুলো তারা আমাদের উপর আরোপ করতে চায় তার দুটি হলো:

ক. গণতন্ত্রকে সেভাবেই গ্রহণ করতে হবে যেভাবে পশ্চিমা ঐতিহ্যে বিশ্বাস করা হয়। (ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি মতে নয়)

খ. ধর্মনিরপেক্ষ আইনের উৎস গ্রহণ করা। যারা বিশেষ কোনো ধর্মগ্রন্থের আইন চায় তারা মূলত চরমপন্থী।

আপনি হয়ত ভাবছেন, গণতন্ত্র গ্রহণ করলেই পশ্চিমারা আপনার উপর খুশি হয়ে যাবে, মুসলিম ঘোষণা করবে। ব্যাপারটি কিন্তু এমন নয়। তারা স্পষ্ট করেই বলেছে, সেই গণতন্ত্র নয়, যে গণতন্ত্র আপনি বুঝেন বা যে গণতন্ত্র আপনি পালন করতে চান ; বরং তাদের বক্তব্য একেবারে Accepting Democracy as understood in the liberal western traditions

তারা গনতন্ত্রবাদী ইসলামি দল ইস্যুতে বলেছে - as in the case of present Egyptian Muslim Brotherhood is not Enough.
প্রিয় পাঠক, লক্ষ্য করুন, র্যা ন্ড ইন্স্টিটিউশনের সংজ্ঞায় যেটা মডারেট ইসলাম, আমাদের কাছে তা পরিষ্কার কুফর।

এ বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদের অনেক আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেন :
وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ.
অর্থাৎ ইহুদি -খ্রিস্টানরা কখনোই তোমার ওপর সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের দ্বীনের অনুসরণ করবে। (সুরা বাকারা : ১২০)

দশম কারণ :

প্রতিপক্ষের ওপর বিজয়ী হবার সবচে সহজ কৌশল হলো, Divide & Rule অর্থাৎ বিভেদ সৃষ্টি করো এবং শাসনকার্য পরিচালনা করো। মোটাদাগে দেখলে এ দেশের অল্প কিছু মানুষই ইসলামপন্থী। অতঃপর বহুদলীয় গণতন্ত্রের ফর্মুলায় এই অল্প সংখ্যক ভোট ভাগ হবে এত এত বিচ্ছিন্ন ইসলামি দলগুলোর মাঝে। একদলের শাইখুল হাদিস দাঁড়াবে আর অপরদলের দাড়িবিহীন শিক্ষিত তরুণ হবে তার প্রতিদ্বন্দ্বী। অতঃপর সমর্থকদের মাঝে শুরু হবে নোংরা কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়ি, গিবত, অপবাদ আর পরনিন্দার বৃষ্টিধারা। দূর থেকে সেক্যুলার -বামপন্থীরা মজা লুটবে। আসলে গণতন্ত্র আর নির্বাচন এই উম্মাহর মাঝে বিভেদ ও অনৈক্যের

বিষফোঁড়া রোপণ করে দিয়েছে, যার ফল আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি। আমাদের দেশে বর্তমানে ইসলামি রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ঠিক কতটি, তা এই মূহুর্তে বলা মুশকিল। তবে এর ভঙ্গুরতা এ থেকেই অনুমান করা যায় যে, এদেশে ইসলামি ঐক্যজোটের সংখ্যাই চার থেকে পাঁচটি!!

একাদশ কারণ:

বর্তমানে নির্বাচনে বিদেশী প্রভাব একটি ওপেন সিক্রেট। প্রতিটি ইলেকশনের পূর্বে বিভিন্ন নেতা-নেত্রীদের ভারত আর ওয়াশিংটনমুখী দৌড়াদৌড়ির দৃশ্য তাই খুবই কমন। বলা যায়, দিল্লী-ওয়াশিংটন থেকেই নির্ধারন করা হয়ে থাকে আগামী পাঁচ বছর কারা এদেশে তাদের প্রক্সি দালাল হিসেবে কাজ করবে। তার ওপরে ভোটে কারচুপি, জাল ভোটপ্রদান, ব্যালট বক্স ছিনতাই, দূর্নীতি, নির্বাচন কমিশনের অবৈধ হস্তক্ষেপ, ক্ষমতার অপব্যবহার; এগুলো তো আছেই। এই সিরিয়ালে সর্বশেষ সংযোজন হলো, এক তরফা প্রহসনের নির্বাচন। ইসলামি দল তো দূরের কথা, সেক্যুলার দলগুলোরও এক্ষেত্রে কিছুই করার ছিল না।

আর গণতন্ত্রের তথাকথিত ‘সর্বশক্তির উৎস’ বলে পরিচত ‘জনগন’ তো এক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া আর কিছুই করে না; এমনকি দুয়েকটি ফাঁকা বুলিও নয়। আসলে সাধারণ জনতার এসব নিয়ে কোনো মাথাব্যথাই নেই। ‘চাচা তোর আপন প্রাণ বাঁচা’ নিয়েই সবাই ব্যস্ত। দেশের মানুষ প্রহসনের নির্বাচনের আগেও যেমন সারাদিনের ক্লান্তি শেষে ঘুমোতে যেত, এখনও তেমনই যায়। দেশের একটি প্রধান রাজনৈতিক দল বারবার ওয়াশিংটনের দিকে হাত তুলে মুনাজাত করেছিল, কিন্তু ওয়াশিংটন আকার ইঙ্গিতে ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছে, আমরা মুখে যাই বলি না কেন, কাজে আমরা তার পক্ষই নিব, যারা আমাদের বেশি সুবিধা দিবে আর বেশি গোলামি করবে। সেক্যুলারদের প্রভু ওয়াশিংটনের এই নীতিটি আপনি আরও ভালো করে

বুঝবেন গণতন্ত্রের পুরোপুরি বিপরীত রাজতন্ত্রবাদী সৌদিদের সাথে তাদের গভীর সম্পর্ক থেকে। আসলে তাদের দরকার কর্তৃত্ব আর আধিপত্যি; গণতন্ত্রের মন্ত্র তো ওরা জপে কেবল মুসলিম উম্মাহ ও তৃতীয় বিশ্বের লোকদের ধোঁকা দেওয়ার জন্যে।

পশ্চিমা বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো সাম্রাজ্যবাদ নীতি। বিভিন্ন মুসলিম দেশে আক্রমন করা, মুসলিম নারীদের ইজ্জত লুণ্ঠন করা, শিশুদের রক্ত ঝরানো, মূল্যবান খনিজ সম্পদ লুটে নেওয়া; এগুলো পশ্চিমাদের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য। এজন্য তারা কখনোই কোনো দেশে এমন কোনো সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে দেবে না, যারা তাদের দখলদারিত্বের বিরোধিতা করবে আর নির্যাতিত মুসলিমদের জন্য জিহাদ পরিচালনা করবে। অথচ এ ব্যাপারে আলিমদের ইজমা হলো, যখন কাফিররা কোনো মুসলিম দেশে আক্রমন করে তখন ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে সারা বিশ্বের মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যায়।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না-

ক. দ্বীন ইসলামের চিরশত্রু ইহুদি-খ্রিস্টানরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে একের পর এক ক্রুসেড যুদ্ধ চালিয়েছে, মুসলিমদের প্রথম কিবলা বাইতুল মাকদিস দখল করে রেখেছে, স্পেন থেকে ইসলামের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে দিয়েছে।

খ. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া মিলে মুসলিমদের ঐক্য ও শক্তির কেন্দ্র খিলাফতকে ধ্বংস করেছে, মধ্যপ্রাচ্যকে ভেঙে খণ্ডবিখণ্ড করেছে। কামাল আতার্তুর্ক নামক গাদ্দারের মাধ্যমে পশ্চিমারা সে সময় কার্যত তুরস্কে ইসলামকেই নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল।

১৯২৪ সালের ২৪ জুলাই লুজেন চুক্তি (Lausanne Treaty) স্বাক্ষর হওয়ার পর হাউস অফ কমন্সে তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড

কার্জন ঘোষণা দিয়েছিল যে, মূল বিষয় হচ্ছে তুরস্ক ধ্বংস হয়ে গেছে এবং এটি আর কোনোদিনও মাথা তুলে দাঁড়াবে না। কারণ, আমরা তাদের আধ্যাত্মিক শক্তি ধ্বংস করে দিয়েছি। আর তা হলো খিলাফত এবং ইসলাম।’ অনুরূপ বাইতুল মাকদিসে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার পর ব্রিটিশ জেনারেল অ্যালেনবি ঘোষণা করেছিল, ‘আজ ক্রুসেডের সমাপ্তি ঘটল।’

আর দামেস্ক দখল করে নেওয়ার পর ফরাসি জেনারেল গরো ((Gourou) তড়িৎগতিতে সালাহউদ্দিন আইয়ুবি রহ.-এর সমাধিস্থলে প্রবেশ করে তার কবরে লাথি মেরে বলেছিল, ওঠো সালাহউদ্দিন, আমরা আবার ফিরে এসেছি।’ বস্তুত খিলাফত ধ্বংসের পর পশ্চিমাদের উল্লাসের কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না।

গ. ইসলামি হুকুমত কায়েমের চেষ্টার জন্যে এবং মুজাহিদদের সাহায্য করার জন্য এরাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হককে হত্যা করেছিল।

ঘ. এরাই সৌদি বাদশাহ ফয়সালকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হত্যা করেছে। বাদশাহ ফয়সালের অপরাধ ছিলো, তিনি আমেরিকার মিত্র ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, মুসলিমদের প্রথম কিবলা বাইতুল মাকদিস পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন এবং পশ্চিমাদের কাছে তেল বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

ঙ. মুসলিমদের পবিত্র ভূমিতে ১৯৪৮ সালে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হলে ইমাম হাসান আল বান্না রহ. যখন দেখলেন, তাঁর চোখের সামনে ফিলিস্তিনকে ধ্বংস করা হচ্ছে, তাই তিনি দশ হাজার মুজাহিদ নিয়ে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করতে চাইলেন। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৪৮ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার তিন রাষ্ট্রদূত বৈঠক করে তাদের সিদ্ধান্তপত্র মিশরের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠায়। এর দুই মাস

পর মিশরের রাজা ফারুকের সরকারী গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান মাহমুদ আব্দুল মাজিদ শহরের সবচেয়ে বড় রাস্তায় ইমাম হাসান আল বান্না রহ.-কে হত্যার চেষ্টা করে। এতে তিনি আহত হন। তাকে হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছিলো। তখন রাজা ফারুকের আরেক ঘনিষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা মুহাম্মাদ ওয়াসফি পুনরায় ইমাম হাসান আল বান্না রহ.-কে গুলি করে শহিদ করে দেয়।

দ্বাদশ কারণ:

আধুনিক কালে নির্বাচন মানেই লক্ষ লক্ষ টাকার ছড়াছড়ি। মিছিল, মিটিং, মাইকিং, পোস্টারিং ইত্যাদিতে কে কাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে, সবসময় তারই প্রতিযোগিতা চলে। একগাদা ভাড়া করা ক্যানভাসার যোগাড় করা হয়। কোথাও কোথাও তো অসভ্য নর্তকী আর গায়িকাদেরও ভাড়া করা হয়। এসব ক্যানভাসারদের কাজই হলো, জোর গলায় নিজ নেতার চরিত্রকে ‘ফুলের মতো পবিত্র‘ বলে দাবি করা আর যে কোনোভাবে প্রতিপক্ষের নামে দুর্নাম ও কুৎসা রটনা করা। একগাদা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, সুযোগ পেলে আকাশের চাঁদ হাতে এনে দেওয়ার গল্পও ছাড়া হয়।

ভোটারদের মনোরঞ্জনের জন্য ক্ষণেক্ষণে পান, তামাক, চা, বিড়ি, সিগারেট, হুক্কা, মদ, গাঁজা পরিবেশন করা হয়। এমনকি প্রয়োজনে নগদ টাকা-পয়সা দিয়ে ভোট কেনা হয়। যে এই কাজ যত বেশি করতে পারবে সে তত বেশি সফল। একজন ইসলামপন্থী না নিজের মিথ্যা গুণগান গাওয়ার জন্য লোক ভাড়া করতে পারে, না অন্যের নামে মিথ্যা বদনাম রটনা করতে পারে, না মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে পারে, না তরুণদের হাতে মদের বোতল আর বৃদ্ধদের হাতে হুক্কার ডিব্বা ধরিয়ে দিতে পারে, না সে দূর্নীতিবাজদের মতো ক্যানভাসে লাখ লাখ টাকা অপচয় করতে পারে, না সে কোটি কোটি টাকা দিয়ে ভোট কেনার মতো জঘন্য কাজ করতে পারে। এসব যদি সে না-ই পারে তাহলে এই প্রতিযোগিতায় তার কোনো স্থান নেই। কেননা,

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلاَنِ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمِّرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَهُ، فَقَالَ: إِنَّا لاَ نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، وَلاَ مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ.

وَأَقَلُّ مَا يُفْعَلُ مَرَّةً فِي كُلِّ عَامٍ؛ لِأَنَّ الْجِزْيَةَ تَجِبُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي كُلِّ عَامٍ، وَهِيَ بَدَلٌ عَنْ النُّصْرَةِ، فَكَذَلِكَ مُبْدَلُهَا وَهُوَ الْجِهَادُ، فَيَجِبُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، إلَّا مِنْ عُذْرٍ... وَإِنْ دَعَتْ

الْحَاجَةُ إلَى الْقِتَالِ فِي عَامٍ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ وَجَبَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَوَجَبَ مِنْهُ مَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ.

[illegible]

[illegible]

وَقَالَ قَتَادَةُ (يُخْتَبَرُونَ) بِالْغَزْوِ فِي السَّنَةِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

[illegible]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

প্রতিনিধিকে বেছে নেয়। ("Election (political science)" Encyclpoedia Britanica Online. Accessed August 18, 2009)

অর্থাৎ রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবন-যাপন পদ্ধতি প্রণয়ন, তাদের সমস্যাদিতে বিচারকরণ, তাদেরকে পরিচালনার উদ্দেশ্যে শাসক নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া। প্রকৃত অর্থে নির্বাচন হলো, জনগণ নিজেদের জন্যে বিধানদাতা, জীবনব্যবস্থা প্রণেতা ও আনুগত্য করার জন্য কোনো উপাস্যকে বাছাই করার প্রক্রিয়া।

নির্বাচনের সূচনা:

নির্বাচন সম্পর্কে Encyclopedia man, myth's magic- এ বলা হয়েছে:

Election, the word derived from the Greek word eloge (choice).The idea is basic to the traditional structure of Christian theology.

অর্থাৎ নির্বাচন শব্দটি উৎসরিত হয়েছে গ্রীক শব্দ Eloge হতে, যার অর্থ হলো পছন্দ। নির্বাচনের ধারণা প্রাচীন খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের ঐতিহ্যগত কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রাচীন কালে নির্বাচন:

প্রাচীন কাল থেকেই গ্রিস ও রোমে নির্বাচন পদ্ধতি ব্যবহার হয়ে আসছে এবং গোটা মধ্যযুগে রোমান সম্রাট ও পোপের মতো ধর্মীয় নেতা বাছাই করতেও নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করা হতো।

("Election (political science)," Encyclpoedia Britanica Online. Accessed August 18, 2009)

প্রাচীন ভারতে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজারা তাদের রাজা নিযুক্ত করত। বাংলার মধ্যযুগের গোড়ার দিকে পাল রাজাদের মধ্যে গোপালকে রাজা নিযুক্ত করতে নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল। (History of Buddhism in India, Translation: A. Shiefner.)

আধুনিক কালে নির্বাচন:

সপ্তদশ শতাব্দির দিকে উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের চিন্তাধারা শুরু হয়। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের সংস্কৃতিতে প্রভাবশালী গোষ্ঠী ছিল পুরুষরাই। নির্বাচকমণ্ডলীতেও তাই এদেরই প্রাধান্য থাকত। অন্যান্য বহু দেশেও একই ধারা চলে আসছিল। গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলোতেও শুরুর দিকের নির্বাচনে জমিদার অথবা শাসক শ্রেণির পুরুষদের প্রাধান্য ছিল। ১৯২০ সাল পর্যন্ত অবশ্য পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত দেশে এবং উত্তর আমেরিকার গণতন্ত্রে শুধু পুরুষদেরই ভোটাধিকার চালু ছিল। এর পর থেকেই বিভিন্ন দেশ মহিলাদের ভোটাধিকার দেওয়ার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়।

১৮৩২ সালে প্রথম সংস্কার আইনে সমস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ভোটাধিকার দেয়। এরপর পর্যায়ক্রমে ১৮৬৭ সালে কারখানার শ্রমিকদের, ১৮৮৪ সালে কৃষি মজুরদের, ১৯১৮ সালে সীমিত সংখ্যক নারীদের, এবং ১৯২৮ সালে সকল নারীদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়।

এ ব্যবস্থায় দীর্ঘকাল পর্যন্ত দরিদ্র মানুষ, দিনমজুর ও নারীদেরকে ভোটাধিকার দেওয়া হয়নি। অথচ বর্তমানে একজনের নির্বাচন অধিকার না থাকা তাদের দৃষ্টিতেও নিন্দনীয়! এভাবে মানব

মস্তিষ্ক থেকে নির্গত এসব ফয়সালা নিজেরাই একসময় বদলাতে বাধ্য হচ্ছে। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মানবরচিত কায়দা-কানুন অপূর্ণাঙ্গতার কারণে দুদিন পরেই পাল্টায়। তাই এটা কখনো প্রকৃত জীবনব্যবস্থা হতে পারে না।

গণতন্ত্র খ্রিষ্টানদের বানানো একটি তন্ত্র:

গণতন্ত্র যে খ্রিষ্টানদের বানানো একটি জীবনব্যবস্থা, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। "Encyclopedia Man, Myth's magic" গ্রন্থে এ ব্যাপারে উল্লেখ আছে:

’’However that the doctrine of election found its most notable expression in Christianity.’’

অর্থাৎ যাই হোক, নির্বাচনের এ মতবাদটির উল্লেখযোগ্য অভিব্যক্তি খ্রিস্টানদের (বিকৃত) ধর্মতত্ত্বের মাঝে পাওয়া যায়।

নির্বাচন ও শুরা ব্যবস্থা কি এক?

এটা স্বীকৃত ও সন্দেহাতীত যে, ইসলাম ও গণতন্ত্র দুটি ভিন্ন জীবনব্যবস্থা, দুটি আলাদা দ্বীন। তেমনি ইসলামের শুরা ও গণতন্ত্রের নির্বাচন পদ্ধতি দুটিও ভিন্ন। অনেকেই মনে করেন, শুরা হলো একজন মুসলিমের মতামত। অতএব যদি কোনো মুসলিম ভোট দেয় তাহলে ভোটের মাধ্যমে তার নির্বাচনে অংশগ্রহণও শুরার অনুরূপ। কিন্তু মূলত ব্যাপারটি তা নয়। বোঝার স্বার্থে আমরা একটি উদাহরণ পেশ করতে পারি। মনে করুন, কারও টেবিলের ওপর কভারযুক্ত দুটি বই আছে। এখন প্রথম বইটি খুলে দেখা গেলো, তা রাসুল কারিম সা. -এর ওপর অবতীর্ণ পবিত্র ‘কুরআন’। দ্বিতীয় বইটি খুলে দেখা গেল, তা কালমার্ক্সের রচিত ‘দ্যা ক্যাপিটাল’। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দুটি বই-ই

কাগজের, দুটি বই -ই কোনো না কোনো কালিতে লেখা। কিন্তু দুটি কি এক ? নাউযুবিল্লাহ ! যে উভয়টিকে এক বলবে, তার ইমান নিশ্চয়ই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়বে। হয় সে ইসলাম ও কুফরের পার্থক্য সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা সে দ্বীন নিয়ে ঠাট্টাকারী।

আবার অনেকেই গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেন। তারা মূলত একটি ইসলামি দলকে ভোটদানের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে এবং ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় গিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। এবার আমরা আগের মতো আরেকটি বাস্তব উদাহরণ দেখি। রাসুলে কারিম সা. -এর ওপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে ইসলামকে অন্যান্য বাতিল ধর্মের ওপর বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে। কুরআনের মাঝে দ্বীনকে বিজয়ী করার নির্দেশনা দেওয়া আছে।

এখন আমরা উপরিউক্ত উদাহরণের মতোই আরেকটি প্রশ্ন করতে পারি যে, কালমার্ক্স রচিত ‘দ্যা ক্যাপিটাল’ দিয়ে কি ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব ? অবশ্যই না। তাহলে অহেতুক কেন আমরা নিজেরা গোমরাহ হচ্ছি এবং অন্যদেরকে গোমরাহ করছি?

ভোট কি শুরা **?**

বর্তমানে কোনো কোনো ব্যক্তি এ ভোট পদ্ধতিকে ইসলামি বলে শুরা ব্যবস্থার প্রতিরূপ বলেন। তারা সাধারণ মুসলমানদেরকে এ আয়াত শুনান :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেনো প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। (সুরা নিসা : ৫৮)

সুতরাং ভোট যেহেতু শরয়ি পরামর্শ তাই এটিও একটি আমানত! তাই তা প্রাপককে ফিরিয়ে দিতে হবে!!

আসুন, দেখা যাক, ভোট কি শরয়ি পরামর্শ নাকি ভিন্ন কিছু?

ভোট ও শুরার মধ্যকার মৌলিক কিছু পার্থক্য:

প্রথমত, ইসলামে শুরা হলো একটি মত ও পরামর্শ,যাকে গ্রহণ ও বর্জন উভয়টি করা যায়। এটাকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা জরুরি নয়। এমনকি খলিফা ভালো ও কল্যাণকর মনে করলে অধিকাংশের মতামতের বিপরীত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু ভোটের ক্ষেত্রে অধিকাংশের রায়কে প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, ইসলামে পরামর্শদাতাদের বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হয়। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে প্রত্যেকেরই ভোট দেওয়ার অধিকার সমান। এমনকি গণতন্ত্রে একজন দেশসেরা বিজ্ঞ লোকের মতামত ও দেশের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও অশিক্ষিত লোকের মতামতের মূল্যায়ন বরাবর।

তৃতীয়ত, শরিয়তের দৃষ্টিতে কাফিররা মুসলিমদের কোনো বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারে না। কিন্তু গণতন্ত্র তাদেরকে এ সুযোগ করে দেয়। তাদেরকে বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তাদেরকে বাদ দেওয়ার আইন করলে সেটা আর গণতন্ত্র থাকবে না। আর গণতন্ত্রের প্রভু ও পূজারীরা তা কোনোদিন হতেও দেবে না।

ভোটকে শুরা বলে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী মুসলিমদের অবস্থা:

প্রতিপক্ষের উপর বিজয়ী হবার সবচেয়ে সহজ কৌশল হলো, Divide & Rule. গভীর দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায়, এ দেশের অল্পকিছু মানুষই ইসলামপন্থী।

অতঃপর বহুদলীয় গণতন্ত্রের ফর্মুলায় এই অল্প সংখ্যক ভোট ভাগ হবে এত এত ইসলামি দলের মাঝে। একদল থেকে কোনো মুফতি বা মুহাদ্দিস দাঁড়াবে, অপরদলে দাড়িবিহীন জেনারেল শিক্ষিত তরুণ দাঁড়াবে। অতঃপর সমর্থকদের মাঝে শুরু হবে নোংরা কাঁদা ছোড়াছুড়ি, গিবত, অপবাদ ও পরনিন্দার বৃষ্টিধারা। দূর থেকে সেক্যুলার-বামপন্থীরা মজা লুটবে। আসলে গণতন্ত্র আর নির্বাচন এই উম্মাহর মাঝে বিভেদ ও অনৈক্যের বিষফোঁড়া রোপণ করে দিয়েছে, যার ফল আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি। আমাদের দেশে বর্তমানে ইসলামি রাজনীতিক দলের সংখ্যা প্রায় বিশের অধিক, যারা প্রত্যেকেই নিজেদেরকে ভোট পাওয়ার হকদার বলে দাবি করছে।

নির্বাচনের মুলো ঝুলিয়ে মুসলিমদের ইমান ও শাসন চুরি:

বাংলাদেশের নির্বাচনে আন্তর্জাতিক প্রভাব একটি ওপেন সিক্রেট। প্রতিটা ইলেকশনের পূর্বে বিভিন্ন নেতা-নেত্রীদের ভারত আর ওয়াশিংটনমুখী দৌড়াদৌড়ি আবশ্যক। কারণ, দিল্লী-ওয়াশিংটন থেকেই নির্ধারন করা হয়ে থাকে, আগামী পাঁচ বছর কারা এদেশে তাদের দালাল হিসেবে কাজ করবে। রাজনৈতিক দলগুলোর তখন এক্ষেত্রে কিছুই করার থাকে না। আর গণতন্ত্রের তথাকথিত ‘সর্বশক্তির উৎস’ জনগণের তো এক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। এমনকি দুএকটি ফাঁকা বুলিও তারা উচ্চারণ করতে পারে না।

পরিশেষে, মুসলিম জনগণের সামনে মুলো ঝুলিয়ে সর্বপ্রথম তাদের অনেকের ইমান কেড়ে নেওয়া হয়। অতঃপর গণতান্ত্রিকদের প্রভু আমেরিকা ও ভারত তাদেরই একজন দালালকে সরকারপ্রধান করে বসিয়ে দেয়। ব্যস, এখন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মডারেট মুসলিম না ঘরকা আর ঘাটকা। না তারা আল্লাহর হতে

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا .

শাইখ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনি হাফিজাহুল্লাহ বলেন, নির্বাচন হচ্ছে একটি মাধ্যম। কিন্তু তা কীসের মাধ্যম? কী হতে উৎসারিত এই মাধ্যম?

এ সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো, নির্বাচন হলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি অন্যতম শাখা, যা জনগণকে সিয়াদাহ তথা সার্বভৌম, কর্তৃত্ব, হুকুম, নিয়ন্ত্রণ, প্রভুত্ব, আধিপত্য ও বিধান নির্ধারণের অধিকার দান করে থাকে। শাসনতন্ত্র বিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকে জানা যায় যে, সিয়াদাহ হচ্ছে সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব, যার ওপর আর কোনো কর্তৃত্ব নেই। তারা বলে, সিয়াদাহ হচ্ছে মানুষের জন্য, সিয়াদাহ জনগণের জন্য। অথচ সিয়াদাহ সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালার হক। এই সিয়াদাহ হতে উৎসারিত হয় আইন প্রণয়নের অধিকার, আইন প্রণয়নের কর্তৃত্ব, বিচারের কর্তৃত্ব, অতঃপর কার্যে পরিণত করার কর্তৃত্ব। আর তারা বলে, এগুলো মানুষের ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করে হতে হবে। মানুষ যা চায় এবং সমর্থন করে তা-ই হবে।

গণতন্ত্র দুটি বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘুর ওপর ভিত্তি এবং সংখ্যালঘুর অধিকার লড়াই এবং বিতর্কের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠে পৌঁছানো। সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার হচ্ছে শাসন করা, আইন প্রণয়ন করা, আইন কার্যকর করা এবং সিদ্ধান্তগুলো পরিচালনা করা। এটিই হচ্ছে গণতন্ত্রের ভিত্তি। তাই আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, নির্বাচন ‘সিয়াদাহ’-এর অর্থকেই বোঝায়।

সে ক্ষেত্রে নির্বাচন হচ্ছে মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন। কীভাবে মানুষের ইচ্ছা জানা যাবে? এ প্রশ্নের জবাবে তারা বলে, নির্বাচন এবং ভোটদানের মাধ্যমে।

সুতরাং ভোটদান হচ্ছে মানুষের ইচ্ছার কথা জানানোর একটি মাধ্যম, যেখানে তাদের নিজেদের

অধিকার থাকবে আইন প্রণয়নের। যে সংসদীয় ব্যবস্থায় বর্তমানে আমরা আছি, এই সংসদ এমন একটি কেন্দ্র, যেখান থেকে অনেক কিছুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে আইন প্রণয়ন। অন্য কথায় বলতে গেলে, আইন প্রণয়নের অর্থ কোনো কিছুকে হালাল মোড়ক দেওয়া অথবা কোনো কিছুর নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়া। আইন প্রণয়নের মানে কোনো কিছুকে হালাল ঘোষণা করা এবং তার হারাম হওয়ার নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়া অথবা কোনো কিছুকে হারাম ঘোষণা করা এবং তার অনুমতি ছিনিয়ে নেওয়া।

অথচ এই বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অধিকার। তাদের এই নীতি আল্লাহর উলুহিয়াত ও প্রভুত্বের সাথে সাংঘর্ষিক। যেহেতু সৃষ্টি আল্লাহ তায়ালার, সেহেতু উলুহিয়্যাত ও সার্বভৌমত্বও একমাত্র তাঁরই। এটিই হচ্ছে তাঁর কর্তৃত্ব (রুবুবিয়্যাত)। আর যিনি ইলাহ, তিনিই হুকুম দেন। তাই আমরা যদি তর্ক করি, স্বতন্ত্রভাবে একজনের হুকুম দেওয়ার অধিকার আছে বলেই বর্ণনা করি তবে নির্বাচনের অর্থ হবে ‘সাইয়িদ’ নির্ধারণ করা।

কোনো মুসলিমের এ ব্যাপারে নূন্যতম সংশয় থাকার অবকাশ নেই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হলেন, আস-সাইয়্যিদ এবং আল-মুতা। আস-সাইয়্যিদ হলো, যার কোনো হুকুমকে অবহেলা করা যায় না। আর আল-মুতা হলো, যার আদেশ কেউ অমান্য করতে পারে না।

তাহলে নির্বাচন কী? নির্বাচনের অর্থ হচ্ছে- কোনো কিছুকে হালাল এবং হারাম ঘোষণার ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের জন্য আমার ইচ্ছার প্রতিফলনে একজন ব্যক্তিকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়ে তার ওপর সন্তুষ্ট থাকা। আর এটা সুস্পষ্ট যে, তা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাথে সাংঘর্ষিক এবং সেই মুসলিমের ইচ্ছার সাথেও সাংঘর্ষিক যে বলে, আমি নিজেকে আল্লাহর আনুগত্যে উপস্থাপন করছি। অন্য কথায়, আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আমি অন্য কাউকে

গ্রহণ করি না, আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ব্যতীত অন্য কাউকে আইনদাতা হিসেবে গ্রহণ করি না, আমি আমার ওপর কোনো শাসককে গ্রহণ করি না। এ অর্থে শাসক বলতে সে নয়, যে শাসন করে; বরং আল্লাহ ব্যতীত যে হুকুম প্রণয়নের অধিকার রাখে। সমসাময়িক অনেকেই এটাকে হাকিমিয়্যা হিসেবে সঠিক বলে আখ্যায়িত করে থাকেন । (ভোটাভুটি সম্পর্কে একটি সাক্ষাৎকারে শায়খের প্রদত্ত বক্তব্যের একাংশ।)

শাইখের কথার সারনির্যাস হচ্ছে- যে গুণটি একমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট, নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ সেটিকে কোনো মানুষের জন্যে সাব্যস্ত করছে। এক কথায়, নির্বাচনের মাধ্যমে তারা আল্লাহর পরিবর্তে ভিন্ন সত্ত্বাকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করছে। সুতরাং এটা শিরক বৈ অন্য কিছু নয়।

সকল ভোট প্রদানকারীই কি কাফির?

এক্ষেত্রে ভোটারদেরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমত, যে সমস্ত ভোটার সত্যিকার অর্থেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার রায়কেই আইন বলে বিশ্বাস করে; যদিও তা শরিয়ার বিরুদ্ধে যাক, এরা প্রকৃত অর্থেই কাফের; যদিও তাদের নাম মুসলমানের।

দ্বিতীয়ত, যারা গণতন্ত্র ও ইসলাম; এসব বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে ভোট প্রদান করে, তাদের জাহালাত শরিয়তের দৃষ্টিতে ওজরযোগ্য হলে এরা কাফির নয়।

তৃতীয়ত, যারা বিভিন্ন ধরনের ভুল মাসআলা বা ভুল প্রচারণার শিকার হয়ে ভোটদান করে, তাদের ক্ষেত্রে কিছুটা তাবিলের অজুহাত থাকায় এরাও কাফির নয়।

খলিফা নির্ধারণ পদ্ধতি:

নির্বাচন একটি শিরকি ব্যবস্থার অংশ এবং এটা স্বয়ং শিরকের একটি মাধ্যম। তাহলে খলিফা নির্ধারণের পথ কী? খলিফা নির্ধারণের সর্বসম্মত তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা খলিফা তিনটি পদ্ধতির কোনো একটির মাধ্যমে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

ক. ইখতিয়ার:

ইখতিয়ার হলো, ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ এর পক্ষ থেকে মনোনীত বা নির্বাচিত হওয়া। উদাহরণত, আবু বকর রা. -এর খিলাফত। তাঁর খিলাফত সাকিফায়ে বনি সায়িদায় ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ এর মনোনয়ন ও নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর সমস্ত সাহাবি তাঁর খিলাফতের পক্ষে ঐকমত্য পোষণ করেন, তাঁর হাতে বাইআত হন এবং তাঁর খিলাফতের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

খ. ইস্তিখলাফ:

পূর্ববর্তী খলিফার নির্ধারণের মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়া। অর্থাৎ পূর্ববর্তী খলিফা সুনির্দিষ্টভাবে কাউকে তাঁর পরবর্তী খলিফা হিসেবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া। যেমন, উমর রা. -এর খিলাফত। তাঁর খিলাফত আবু বকর রা.- এর নির্ধারণের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছিল।

গ. শুরা:

শুরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পূর্ববর্তী খলিফা কর্তৃক ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’-কে দায়িত্ব দেওয়া। তাদের দায়িত্ব হবে, তাদের মধ্য থেকে কোনো একজনকে পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ করা। যেমন, উসমান বিন আফফান রা.- এর খিলাফত। উমার রা. তাঁর পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ করার জন্য শীর্ষস্থানীয় ছয়জন সাহাবির সমন্বয়ে একটি শুরা কমিটি গঠন করেছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে আব্দুর রহমান বিন আওফ রা. মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের

[illegible]

[illegible]

[illegible]

وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّالِثُ، فَهُوَ الْقَهْرُ وَالِاسْتِيلَاءُ، فَإِذَا مَاتَ الْإِمَامُ، فَتَصَدَّى لِلْإِمَامَةِ مَنْ جَمَعَ شَرَائِطَهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِخْلَافٍ وَلَا بَيْعَةٍ، وَقَهَرَ النَّاسَ بِشَوْكَتِهِ وَجُنُودِهِ، انْعَقَدَتْ خِلَافَتُهُ لِيَنْتَظِمَ شَمْلُ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَامِعًا لِلشَّرَائِطِ بِأَنْ كَانَ فَاسِقًا، أَوْ جَاهِلًا، فَوَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: انْعِقَادُهَا لِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا بِفِعْلِهِ.

[illegible]

أَهْل الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ وَالرُّؤَسَاءِ.

أَهْل الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالرُّؤَسَاءِ وَوُجُوْهِ النَّاسِ.

[illegible]

فَأَمَّا أَهْلُ الِاخْتِيَارِ فَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيهِمْ ثَلَاثَةٌ: أَحَدُهَا: الْعَدَالَةُ الْجَامِعَةُ لِشُرُوطِهَا وَالثَّانِي: الْعِلْمُ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى مَعْرِفَةِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْإِمَامَةَ عَلَى الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهَا. وَالثَّالِثُ: الرَّأْيُ وَالْحِكْمَةُ الْمُؤَدِّيَانِ إلَى اخْتِيَارِ مَنْ هُوَ لِلْإِمَامَةِ أَصْلَحُ، وَبِتَدْبِيرِ الْمَصَالِحِ أَقْوَمُ وَأَعْرَفُ

[illegible]

উপযুক্ত ও সজাগ। (আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা: পৃ. নং ১৭-১৭, প্রকাশনী: দারুল হাদিস, কায়রো)

গণতন্ত্রে ভোটাধিকার বা নির্বাচন অধিকার প্রাপ্তদের মাঝে কোনোরূপ পার্থক্য করা হয় না। সকলেরই মান এখানে সমান। যেখানে মানুষ সামান্য টাকার লোভে পড়ে কিংবা প্রভাবশালী কোনো নেতার ভয়ে অধিকাংশ সময়ই একজন বখাটে, সন্ত্রাসী বা অযোগ্য কাউকে নিজেদের নেতা বানায়। অন্যদিকে ইসলামে অধিক যোগ্য আলিম ও আমিরদের সম্মতিতে একজন যোগ্য ও উত্তম খলিফা নির্বাচিত হন। দুটোর মাঝে যে বিশাল তফাৎ তা জ্ঞানবান লোক মাত্রই বুঝতে সক্ষম হবেন। যারা বলে থাকে, নির্বাচন ও শুরা একই, তারা যেন শুরাসদস্য হওয়ার যোগ্য ‘আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ’ এর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যাবলী এবং ভোটাধিকারপ্রাপ্ত একজন নাগরিকের মাঝে তুলনা করে দেখেন। এ বিশাল তফাৎ থাকার পরও নিছক গোঁড়া ও অন্ধ হলেই কেবল সে বলতে পারে, নির্বাচন ও শুরা একই বিষয়।

আমাদের আলিমগণ; এমনকি সাধারণ মানুষেরাও এখন অকপটে এ কথা বলে বেড়ায় যে, ইহুদি-খ্রিষ্টানরা ইসলামের বিরুদ্ধে নীলনকশা করে এগুচ্ছে। তারা একশ বছর আগে একটি পরিকল্পনা করে। এরপর ধীরে ধীরে তা বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। মুসলমানরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ষড়যন্ত্র করার কথা বিশ্বাস করলেও তাদের অধিকাংশই আজ ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের প্রণীত সে নীলনকশায় পা দিয়েছে। বরং তাকেই আঁকড়ে ধরে নিজেদের জীবন পার করতে চাইছে। এমনকি একে নেক ও পূণ্যের কাজ বলেও দাবি করছে। অনেকে ষড়যন্ত্র বলতে শুধু সাংস্কৃতিক ও চারিত্রিক অঙ্গনের বিপর্যয়ই বুঝে থাকে। অথচ আমল নষ্ট করার চাইতে আমাদের আকিদা ও ইমান নষ্ট করাই তাদের মূল ও প্রধান টার্গেট। আমরা তাদের দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত হলেও আসল ও প্রধান ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অজ্ঞ রয়ে গেছি। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের ইমান-আকিদা রক্ষা

করুন এবং তাগুতদের সব ধরনের ষড়যন্ত্র অনুধাবন করার তাওফিক দান করেন।

ইসলামি গণতন্ত্রীদের করুণ হাল ও শরিয়া কায়েমের পদ্ধতি:

মুসলিম দেশসমূহের অনেক ইসলামি দল গণতান্ত্রিক পন্থায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এসব দল দ্বারা ইসলামের শাখাগত কিছু খেদমত হয়েছে। কিন্তু মৌলিক ও চূড়ান্তভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারা পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা এখানে বিশ্বের একাধিক দেশে ইসলামি রাজনীতি চর্চাকারী কয়েকটি বৃহৎ প্রাচীন ইসলামি দলের শুধু শরিয়া প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতার উপাখ্যান তুলে ধরব।

বিভিন্ন ইসলামি গণতন্ত্রীদের ইতিহাস:

০১. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম:

১৯১৯ সালে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশদের গোলামি থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এ দলের প্রতিষ্ঠা হয়। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে এ দলের অনেক শীর্ষ নেতাসহ কর্মীরা নির্যাতন ভোগ করেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালে যখন ব্রিটিশরা এদেশকে চলে যায় তখন এ দলটি দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

ক. জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ:

তারা ভারতেই থেকে যান। কিন্তু তারা রাজনৈতিক অবস্থান থেকে সরে এসে দলটিকে দাওয়াতি সংগঠনে রূপ দান করেন। কিন্তু যেহেতু ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে এ দলের অবদান অপরিসীম, তাই ভারত সরকার তাদেরকে পার্লামেন্টে চিরস্থায়ী কয়েকটি সংরক্ষিত আসন দেয়। তখন থেকেই তারা কংগ্রেসকে সমর্থন দিয়ে আসছেন।

খ. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পাকিস্তান:

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তারা রাজনৈতিক চর্চা শুরু করেন। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে সত্তর দশকে পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে দলটির প্রধান মুফতি মাহমুদ রহ. উক্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হবার পর সীমান্ত প্রদেশে মদ, সুদ ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু তা কার্যকর হবার পূর্বেই ক্ষমতাসীন জুলফিকার আলী ভুট্টো সরকার তাকে পদচ্যুত করে!

বর্তমানে তার ছেলে মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেবের নেতৃত্বে জমিয়ত পরিচালিত হচ্ছে। বিগত কয়েক নির্বাচনে তাদের অবস্থা হচ্ছে-

০১. নব্বই দশকে বেনজীর ভুট্টোর সাথে জোট গঠন।

০২. বিগত নির্বাচনে এককভাবে ১২ আসন অর্জন। এর আগে ৪ আসন।

০৩. এর পূর্বে সব ইসলামি দলের সাথে জোট করে ৫৩ আসন। একবার সীমান্ত প্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী হলেও সেখানে শরিয়া প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ।

উল্লেখ্য, এ দলটির মধ্যে একাধিকবার ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। বর্তমানে পাকিস্তানে জমিয়ত ‘এফ’ এবং ‘এস’ নামের দুটি দল আছে।

০২. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ:

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে এ দলটির কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য। দলটির মহাসচিব মুফতি ওয়াক্কাস সাহেব তিনটি প্রতীক (লাঙ্গল, খেজুরগাছ ও ধান) নিয়ে তিনবারের নির্বাচিত এমপি। এরশাদের আমলে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী। তারপরও ইসলামি শরিয়ত প্রতিষ্ঠায় দলটির কার্যকরী কোনো ভূমিকা দৃশ্যমান হয়নি। এ দলের সফলতা ও ব্যর্থতা নিয়ে আপনারাই ভাবুন। পরবর্তীতে ২০০১ সালে দলটির মধ্যেও ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। সবকিছু মিলিয়ে বলা চলে যে, তারা খুব একটা কার্যকরী অবস্থানে নেই।

০৩. ইখওয়ানুল মুসলিমীন:

খিলাফতের পতন হয় ১৯২৪ সালে। তখন মুসলিমদের একতা ধরে রাখতে এবং তাদেরকে সঠিক নির্দেশনা দিতে ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠা হয় ‘ইখওয়ানুল মুসলিমিন’। তাদের শ্লোগান ছিলো- জিহাদ, তারবিয়াত ও দাওয়াত। তাদের মনোগ্রামই তা বলে দিচ্ছে।

ইখওয়ান বায়তুল মুকাদ্দাস রক্ষার্থে ইহুদিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে দলে দলে মুজাহিদ পাঠিয়েছিল। কিন্তু অল্পদিনেই ইখওয়ান সরকারের চক্ষুশুলে পরিণত হয়। শুরু হয় ইখওয়ান নেতাদের ধর-পাকড়। ১৯৪৯ সালে তখনকার মিসরের রাজা ফারুকের গুপ্তবাহিনী শহিদ করে দেয় ইখওয়ানের প্রতিষ্ঠাতা হাসানুল বান্না রহ.-কে। এরপর ইখওয়ানের সাহায্যে ১৯৫২ সালে সেনাঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজা ফারুককে উৎখাত করে রোমে নির্বাসিত করা হয়। যেহেতু সেনা অভ্যুত্থানের প্রতি ইখওয়ানের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল, তাই সেনা সরকার নজিব তাদেরকে অনেক সমীহ করে। কিন্তু নজিবের পর যখন জামাল আব্দুন নাসের ক্ষমতায় আসল তখন সে প্রথমে ইখওয়ানকে সমর্থন করলেও পরবর্তীতে ইখওয়ানকে আতঙ্ক মনে করে ইখওয়ান দমনে লিপ্ত হয়ে যায় এবং নিজে তখনকার দ্বিতীয় পরাশক্তি রাশিয়া ব্লকে যোগ দেয়। তার আমলেই সাইয়িদ কুতুব শহিদ রহ.-কে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়। এভাবে ইখওয়ান প্রথমবারের মতো সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তথাকথিত নুসরার দ্বারা প্রতারিত হয়।

জামালের পর ক্ষমতায় আসল আনওয়ার সাদাত। সে ক্ষমতায় এসে ইখওয়ানিদেরকে জেল থেকে মুক্ত করে দেয় এবং ইসরাইলের সাথে ১৯৭৩ সালে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধে প্রথমে কিছুটা জয় লাভ করলেও পরে মারাত্মকভাবে পরাজিত হয়। তখন বাধ্য

হয়ে ইসরাইলের সাথে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং রাশিয়ান ব্লক থেকে মার্কিন - ইসরাইল ব্লকে যোগ দেয়। এর পুরস্কার স্বরূপ সর্বপ্রথম একজন আরব হিসাবে তাকে শান্তিতে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। যেহেতু ইখওয়ান তা মেনে নেয়নি তাই শুরু হয় ইখওয়ানের ওপর নির্যাতন । এভাবে ইখওয়ান দ্বিতীয়বারের মতো প্রতারিত হয়। উল্লেখ্য , তখন বর্তমান আলকায়দা প্রধান শায়খ জাওয়াহিরিকে একজন ইখওয়ানি হিসাবে কারাগারে পাঠানো হয়।

আনওয়ার সাদাতের পর ১৯৮০ ক্ষমতায় আসল হোসনি মোবারক। হোসনি মোবারকের পতনের পর ইখওয়ান নতুন বন্ধুরূপে গ্রহণ করল গণতন্ত্রকে। তাই ফ্রিডম জাস্টিস পার্টি নামে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ক্ষমতায় গেল। কিন্তু গণতন্ত্র তাদেরকে উগড়ে ফেলল। এভাবে ইখওয়ান তৃতীয়বারের মতো প্রতারিত হলো।

গণতন্ত্রের পর ইখওয়ান অহিংস আন্দোলন করার স্বার্থে বেছে নিল রাজপথকে। গঠন করল সমমনাদের নিয়ে নতুন জোট "আত্তাহালুফুল ওয়াতানী লিদা 'মিশ শরীয়াহ " (التحــالف الوطــني لــدعم الشــرعية) অর্থাৎ শরীয়াহর সমর্থনে জাতীয় ঐক্য। যার লক্ষ্য স্বাধীনতা , ন্যায়বিচার , প্রগতি , গণতন্ত্র এবং সেনা স্বৈরশাসনের অবসান।

মোটকথা, ইখওয়ানের হেটে চলার পথ যখন বাধাপ্রাপ্ত হলো তখন তারা বসে বসে চলার পথ অবলম্বন করল। যখন বসার পথ বন্ধ হলো তখন তারা ধরল হামাগুড়ির পথ। কিন্তু এতকিছুর পরও আমাদেরকে শুনতে হলো ইখওয়ানের নিষিদ্ধ হওয়ার মতো প্রক্রিয়া , ইখওয়ানি নেতাদের সম্পত্তি জব্দ হওয়ার নির্মম খবর।

এই তথাকথিত অহিংস আন্দোলন তাদেরকে কী উপহার দিল ? অহিংসবাদের এই ধর্মটি কি আসলে মুসলিমদের ? যে ইখওয়ানের সূচনা হয়েছিল জিহাদ দ্বারা (তাদের

[illegible]

[illegible]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.

[illegible]

[illegible]

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الشَّامِ... فَقَالَ عُمَرُ:..إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ.

[illegible]

করবেন। (মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/১৩০, হা. নং ২০৭ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত)

এখন তাহলে বলুন, গণতন্ত্র/অহিংসবাদ কোন ধরনের ইসলাম যে, এটার মধ্যে ইসলাম খুঁজব এবং এর দ্বারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করব?

সর্বশেষ ২০১২ সালের জুন মাসে প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে মুহাম্মাদ মুরসি মিশরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিন্তু মাত্র এক বছরের ব্যবধানে ২০১৩ সালের ৩রা জুলাই মুরসির বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো হয়। হাজার হাজার কর্মী-সমর্থদের হত্যা করা হয়। বর্তমানে মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতা-কর্মীদেরকে জুডিশিয়াল কিলিংয়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মিশরের জালিম সরকার ফাত্তাহ সিসি।

০৪. জামায়াতে ইসলামি:

এটা ইসলামি দল কিনা, সে ব্যাপারে উপমহাদেশের আলিমদের বক্তব্য হলো, এটা ইসলামি দল নয়। কিন্তু যেহেতু এ দলটি নিজেকে ইসলামি দল দাবি করে সে হিসাবে এখানে এদের আলোচনা করা হচ্ছে। ১৯৪১ সালে এ দলটির জন্ম। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে তারা ছড়িয়ে আছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা কোথাও এককভাবে বা নেতৃত্ব দিয়ে জোটবদ্ধভাবে ক্ষমতায় যেতে পারেনি। এমনকি কোনো প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীও হতে পারেনি। তারা সর্বদা অন্যের ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এখন দিনদিন ক্রমেই সংকীর্ণ পথ দিয়ে যাত্রা করছে, যা তাদের চরম ব্যর্থতারই পরিচয় বহন করে।

এ দলগুলো ছাড়াও বিশ্বের অনেক দেশে আরও গণতান্ত্রিক ইসলামি দল আছে। যদি এগুলোর তালিকা দিতে থাকি তাহলে হয়ত তালিকা শেষ করতে না করতেই খবর পাব, এ মুহূর্তে আরেকটি ইসলামি দলের জন্ম হয়েছে। যদি পারেন তাহলে শুধু বাংলাদেশের দলগুলোই হিসাব করুন। গণতান্ত্রিক পন্থায়

তুরস্ক, আলজেরিয়া, তিউনিশিয়াসহ অনেক দল নির্বাচিত হলেও অনেকে ক্ষমতায় যাওয়ার পুর্বেই ছিটকে পড়েছেন। আবার কেউ ক্ষমতায় গেলেও কোথাও এক সেকেন্ডের জন্যও একটি গ্রামে পরিপূর্ণ শরীয়াহ কায়েম করতে পারেননি। এ রকম কিছু উদাহরণ।

ক. তুরস্ক:

০১. আরবী ভাষায় আযান পুনরায় চালু করার জন্যে ১৯৬০ সালে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট আদনান মেন্দারেসের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো হয়। এরপর তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

০২. ১৯৮০ সালে তুরস্কের সেক্যুলার সেনাবাহিনী, মধ্যমপন্থী-ইসলামপন্থী কোয়ালিশনের সরকারকে আবার ক্ষমতাচ্যুত করে এবং ইসলামী দল নিষিদ্ধ করে।

০৩. ১৯৯৭ সালে তুরস্কের ইসলামপন্থী প্রধানমন্ত্রী নাজিম উদ্দীন আরবাকান কট্টর ইসলামবিদ্বেষী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সেনাবাহিনীর চাপের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

খ. তিউনিসিয়া:

১৯৮৯ সালে তিউনিসিয়ার সেনাবাহিনী ও পশ্চিমা সমর্থিত শাসক যখন দেখতে পেলো রশীদ ঘানুশীর নেতৃত্বাধীন ‘আন নাহদা’ নির্বাচনে অংশগ্রহনে বাধা স্বত্তেও স্বতন্ত্রভাবেই বিপুল ভোট পাচ্ছে তখন ২৫ হাজার ইসলামপন্থীকে বিশৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে জেলে ঢুকিয়ে দেয় আর সেই সাথে কয়েকজন নেতাকে ফাঁসিতেও ঝুলিয়ে দেয়।

গ) আলজেরিয়া:

১৯৯২ সালে আলজেরিয়াতে ‘ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট’ যখন বিপুল ভোটে বিজয়ী হলো তখন সেখানে

সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো হলো। ৩০ হাজার ইসলামপন্থীকে জেলে ঢুকানো হলো। এরপর শুরু হয় গৃহযুদ্ধ।

ঘ) ফিলিস্তিন:

২০০৬ সালে ফিলিস্তিনের নির্বাচনে হামাস বিজয়ী হয়। শুরু হয়ে যায় ইজরায়েল ও পশ্চিমা বিশ্বের হাউকাউ। ইসরাইল গাজা আক্রমণ করে এবং অবরোধ শুরু করে।

ঙ.) মিশর:

২০১২ সালে মিশরে মুরসির নেতৃত্বে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে ব্রাদারহুড ক্ষমতায় আসে। তখন এটাকে গণতান্ত্রিক পন্থায় ইসলামের বড় একটি বিজয় হিসাবে দেখানো হচ্ছিল। কিন্তু এক বছরের মাথায়ই সেনা ক্রু ঘটল এবং মুরসিসহ হাজার হাজার নেতাকর্মীকে জেলে ঢুকানো হলো।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: উপরে যাদের কথা বলা হয়েছে, তাদের বেশিরভাগকেই প্রকৃত অর্থে ইসলামী বলা যায় না, বড়জোর ইসলাম ঘেঁষা জাতীয় রাজনৈতিক দল বলা যায়। আর যাদেরকে কিছুটা বলা চলে তারাও তাদের ক্ষমতাসীন অবস্থায় দীন কায়েম করতে পারেনি। কারণ, ইসলামী রাষ্ট্রের মূল মানদ- পূরন করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে।]

যদি আমরা গণতান্ত্রিক দলগুলোর প্রতি চোখ রাখি তাহলে দেখতে পাবো-

*তারা বারবার আদর্শ বদলিয়েছে।

*নিজেদের মধ্যে ভাঙ্গন তৈরী করেছে।

*নিজেদের প্রধান শত্রু বানিয়েছেন স্বদেশের ভিন্ন মতাবলম্বী জনতাকে।

*আসন অর্জনের মধ্যে আবহাওয়ার মতো পরিবর্তন হয়েছে।

*একই নামে একাধিক দেশে অনেক দল আছে, কিন্তু একটির সাথে আরেকটির সম্পর্ক নেই।

*উম্মাহর দুর্দিনে তাদের অবস্থান হচ্ছে, প্রথমে সভা-সেমিনার, প্রতিবাদ-সমাবেশ, পরে নীরব দর্শক।

শরিয়া প্রতিষ্ঠার উপায়:

এবার ভেবে দেখুন, বর্তমানে বিশ্বে কোন পদ্ধতিতে শরিয়া প্রতিষ্ঠিত আছে? কারা আবারও সমর্থ হয়েছে মুসলিম ভূখণ্ডে তাওহিদের পতাকা উড্ডয়ন করতে? এবার আসুন তাদের আদর্শ একটু পর্যালোচনা করি।

তারাই চিনতে পেরেছেন যে, আসল শত্রু স্বদেশী জনতা নয়; বরং বিদেশী ক্রুসেডার ও স্বদেশী দালাল। তারা রক্ত দিয়েছেন তবুও হিকমতের নামে মালহামার নবীর (যুদ্ধের নবির) আদর্শ বদলাননি।

তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে অবস্থান করলেও সবটাই একইসূত্রে গাঁথা। দিন যত যায় তাদের পরিধি তত বাড়ে। মুসলিমবিশ্ব আবারও যেন কালেমাখচিত কালো পতাকাবাহীদের দখলে আসছে বলে প্রতীয়মান হয়।

গণতান্ত্রিক পন্থায় সবচেয়ে কম বয়সী দলের জন্ম ১৯৪১ সালে। জিহাদি পন্থায় সবচেয়ে বর্ষীয়ান দলের জন্ম নব্বই দশকে।

আজ প্রায় শতাব্দীকাল হয়ে গেলেও গণতান্ত্রিক পন্থায় বিশ্বের কোথাও এক সেকেন্ডের জন্যও পরিপূর্ণভাবে শরিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু তারা যেখানে শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করেন তা আলহামদুলিল্লাহ ‘আলা মিনহাজিন নাবুওয়্যাহ’-র আদলেই হয়ে থাকে।

উম্মাহর দুর্দিনে তাদের অবস্থান হচ্ছে- প্রথমে জিহাদের ঘোষণা, পরে বাছাই ও টার্গেট করে তাগুতকে জাহান্নামে প্রেরণ।

[illegible]

[illegible]

عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَهُوَ مَرِيضٌ، قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

وَقَالَ الدَّاودِيّ: الَّذِي عَلَيْهِ الْعلمَاء فِي أُمَرَاءِ الْجور أَنه إِن قدر على خلعه بِغَيْرِ فتْنَة وَلَا ظلم وَجب، وإلاَّ فَالْوَاجِب الصَّبْر، وَعَن بَعضهم: لَا يجوز عقد الْولَايَة لفَاسِق ابْتِدَاء، فَإِن أحدث جوراً بعد أَن كَانَ عدلا اخْتلفُوا فِي جَوَاز الْخُرُوج عَلَيْهِ، وَالصَّحِيح الْمَنْع إلاَّ أَن يكفر فَيجب الْخُرُوج عَلَيْهِ.

[illegible]

ইসলামি সংসদ নিয়ে একটি ভুল চিন্তার অপনোদন :

কিছু মানুষের ধারণা, সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেই ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে। অধিকাংশের রায় নিয়ে সব ইসলামি আইন করে ফেলা যাবে। আর এর মাধ্যমেই ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

এ এক বিরাট ভুল ও স্থুল চিন্তা। আল্লাহর আইনের প্রকৃত মর্যাদা ও গুরুত্ব না বোঝায়ই মূলত এমন ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতা কেন, যদি সকল সাংসদও বর্তমান সিস্টেমে ইসলামি আইন পাশ করে তবুও তাকে ইসলাম প্রতিষ্ঠা বলা যাবে না। কারণ, এর মূলেই রয়েছে যত গলদ। তাই শাখা যতই ইসলামিকরণ হোক না কেন, তা কোনোদিন ইসলাম হয়ে যাবে না। যেমন কোনো ড্রামের পানি নিষ্কাশনের জায়গায় পঁচা ইদুর থাকলে উপর থেকে যত ভালো ও বিশুদ্ধ পানিই ঢালা হোক না কেন, সব পঁচা ও নোংরা পানিই বের হবে। ঠিক তেমনই গণতান্ত্রিক সিস্টেম ঠিক রেখে যতই ইসলাম কায়েমের কথা বলা হোক না কেন, যতই দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হোক না কেন, যতই সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ইসলামি আইন বাস্তবায়ন করা হোক না কেন, তা কোনোদিন ঐ ইসলাম হবে না, যে ইসলাম আল্লাহ ওা তাঁর রাসুল চান। এটা হবে ঐ পঁচা ইদুরের দুর্গন্ধময় পানির মতো নষ্ট ও বিকৃত ইসলাম।

অনেকে হয়ত এখনও বুঝে উঠতে পারছেন না যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সংসদে ইসলামি আইন পাশ হলে সেটা কেন ইসলাম কায়েমের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেন এটাকে সঠিক ইসলামিকরণ না বলে নষ্ট ও বিকৃত ইসলামিকরণ বলা হচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্যে বলছি:

বর্তমান গণতান্ত্রিক সংসদে নিয়ম হলো, কোনো আইন পাশ করাতে হলে প্রথমে আইনের খসড়া করে সংসদে

প্রস্তাব পেশ করা হয়। এরপর সাংসদদের হ্যাঁ -না ভোট নেওয়া হয়। যে পক্ষে মত বেশি আসবে সে পক্ষের রায়ই চূড়ান্ত হবে। অর্থাৎ প্রস্তাবিত আইন পাশ হওয়ার ক্ষেত্রে ফিফটি ফিফটি চান্স থাকে। চাইলে হ্যাঁ -ও বলা যায় , অনুরূপ না -ও বলা যায়। এটাকে আমরা সহজে বলতে পারি , প্রস্তাবিত আইনটি পর্যবেক্ষণ করা হয়। ভালো বা মন্দ যাচাই করে তারপর এটাকে আইনের রূপ দেওয়া হয় বা রিজেক্ট করা হয়।

এবার আপনি চিন্তা করে দেখুন , উদাহরণস্বরূপ সংসদে যখন চুরির জন্য হাত কাটার আইনের ব্যাপারে প্রস্তাব পেশ করা হবে , তখন এটা আইন হওয়া ও না হওয়া নিয়ে ফিফটি ফিফটি চান্স সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ সংবিধান অনুযায়ী এটা আইন হলেও ঠিক আছে, আবার আইন না হলেও ঠিক আছে।

একজন মুসলিম হিসাবে আপনি বলুন , আল্লাহর আইনের এমন অমর্যাদা দিলে তার ইমানের কী অবস্থা হবে !!! এটা কি আল্লাহর আইন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা নয় ? এটা কি আল্লাহর আইনের ব্যাপারে স্পষ্ট অবজ্ঞা নয় ?? এটা কি আল্লাহর আইনের চাইতে নিজেদের রায় বা মতামতকে অগ্রাধিকার দেওয়া নয় ???

অথচ আল্লাহ বলেন :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন , তখন কোনো মুমিন পুরুষ বা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন কোনো অধিকার নেই। ' (সুরা আহজাব : ৩৬)

তাহলে আল্লাহর স্পষ্ট আইন যখন সংসদে পর্যালোচনার জন্য পেশ করা হলো , তখনই প্রমাণ হয়ে

গেল যে, আল্লাহর সিদ্ধান্ত বা আল্লাহর আইনে আমরা সন্তুষ্ট নই; বরং এতে আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারি। আল্লাহর আইনই চূড়ান্ত নয়; বরং আমরা যেটা পাশ করব, সেটাই আইন। আল্লাহর আইন আমাদের অধিকাংশের মতের অনুকূলে হলেই কেবল আইন হবে, অন্যথায় সেটা কোনোদিনও আইনের মর্যাদা পাবে না। মোটকথা অধিকাংশের মতামত পাওয়ার আগ পর্যন্ত সেটা আইন নয়, মেজরিটি অংশের অনুমোদন পাওয়ার পরই সেটা আইন হচ্ছে। তাহলে এটাকে আল্লাহর আইন বলা হয় কীভাবে? এটা তো পরিষ্কার মানবরচিত আইন। আর কাফিররা তো এটাই চায় যে, মানুষের মতই চূড়ান্থ থাকুক, আল্লাহর আইন নয়।

এটাকে কি কোনো সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মুসলিম ইসলাম প্রতিষ্ঠা বলার দুঃসাহস দেখাবে? এ তো ইসলামের চূড়ান্ত অমর্যাদা! এ তো আল্লাহর আইনের চরম অসম্মান!! আল্লাহর স্পষ্ট আইনকে মানুষের সামনে পর্যালোচনার জন্য পেশ করা তো পরিষ্কার কুফর। অথচ এ কুফরকেই আপনি ইসলাম বলে প্রচার করছেন।

আপনি যদি মনে করেন, গণতান্ত্রিক সিস্টেমে সরকার হয়েই সব সংবিধান পাল্টে ফেলবেন, তাহলে এখনও আপনি বোকার স্বর্গে বাস করছেন! এ সিস্টেমের কাছে আপনি একদিনও টিকতে পারবেন না। শেষ আপনাকে ঐ পথেই যেতে হবে, যে পথে অন্যরা চলে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম কায়েম করেছেন। আপনি যখন গণতান্ত্রিক সিস্টেম ঠিক রেখে সংসদ চালাবেন, তখন তো প্রতিনিয়ত আপনি কুফরকে প্রমোট করছেন, আল্লাহর আইনের অবমাননা করে চলছেন। আর যদি সিস্টেম পাল্টাতে চান, তাহলে তো গণতান্ত্রিক সিস্টেমে পাল্টাতে পারবেন না; বরং সশস্ত্র সংগ্রামের পথেই অগ্রসর হতে হবে। যেটা আপনার দুদিন পরে করতে হবে, সেটা দুদিন আগে করেন না কেন? না পারলে কমপক্ষে ইদাদ ও দাওয়াতের কাজ জারি রাখেন। রুখসতের পথ ছেড়ে হিকমতের নামে

কুফরের পথ মাড়ানোর মতো বোকামি পৃথিবীতে আর আছে কি?

হে জাতির কর্ণধারগণ, সাধারণ মানুষের আবেগ ও ইসলামের প্রতি ভালোবাসাকে পুঁজি করে এভাবে ইসলামের অপমান বন্ধ করুন, আল্লাহর আইনকে অবজ্ঞা করার পথ ছেড়ে আসুন। বাংলাদেশের সব মানুষ যদি আজ নামাজের পক্ষে চলে যায়, আর এ চাওয়ার ভিত্তিতেই সংসদে নামাজের আইন পাশ করা হয়, তবুও সেটা কুফরই থেকে যাবে, ইসলাম হওয়ার নূন্যতম কোনো সুযোগ নেই। তাই ইসলামপ্রিয় সাধারণ মানুষকে আর বোকা বানাবেন না। সত্যিটা জানান, জানার সুযোগ করে দিন। এমন কুফরি সিস্টেমের ইসলাম ট্রাম্প আর পুতিন পছন্দ করতে পারে, আল্লাহ আর রাসুল কোনোদিন এর অনুমোদন দেবেন না।

যদি মনে করেন, আমার কথা ভুল, উপরে বলা মাসআলা বেঠিক, তাহলে চ্যালেঞ্জ করছি এর বিপরীতটা প্রমাণ করুন। আর যদি এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে না পারেন, তাহলে মানুষকে ইসলামের অপব্যাখ্যা দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। ইসলামকে সেই পথে প্রতিষ্ঠা করুন, যে পথে সত্যিকার ইসলাম প্রতিষ্টা হয়, যে পথে আল্লাহ ও রাসুল দ্বীন প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। আল্লাহ ও রাসুলের দেখানো সে পথ অনুসরণ করেই মুষ্টিমেয় কিছু লোক আজ বিশ্বের তাবৎ তাগুতি শক্তির ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে বিশ্বজুড়ে ৫০ লক্ষাধিক বর্গ কিলোমিটার আয়তনের অধিক ভূখণ্ডে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে এবং সেসব অঞ্চলে পূর্ণ শরিয়া বাস্তবায়ন করেছে। এগুলোর তো কোনো খোঁজ রাখেন না! এসব উৎসাহমূলক কোনো সংবাদ তো মানুষকে জানাতে চান না। বরং এসবকে উল্টো সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বলে প্রচার করেন!!

শেষে শুধু একটা কথা বলি, বর্তমানে আমাদের দেশে ইসলামি শাসনব্যবস্থা নেই, তো কমপক্ষে ময়দান খালি রাখেন। সময়মতো আল্লাহর বান্দারা ঠিকই এ

উর্বর জমি আবাদ করবে। কিন্তু মাঠ খালি দেখে মানুষের ইসলামি আবেগকে পুঁজি করে ময়দান নোংরা করবেন না। কেননা, আপনারা যা করতে চাচ্ছেন, যে সিস্টেমে ইসলাম চাচ্ছেন, তা ইসলাম নয়, বরং স্পষ্ট কুফর। তাই বলি, দুষ্ট গরুর চেয়ে খালি গোয়াল ভালো।

ইসলামি গণতন্ত্রীদের আরেকটি ধোঁকা ও অলীক কল্পনা :

কিছু ভাই মনে করেন, গণতন্ত্র কুফরি তন্ত্র, এটা আমরা স্বীকার করি। তবে বর্তমান যুগে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যেহেতু গণতান্ত্রিক নির্বাচন ছাড়া কোনো উপায় নেই, তাই আমরা এটাকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে ক্ষমতায় যাব। প্রথমেই যেটা আমরা করব, তা হলো, সংসদের কুফরি সিস্টেমকে আমরা উৎখাত করে ফেলব। সংসদে শরিয়তের নির্ধারিত কোনো আইন নিয়ে ভোটাভুটি হবে না; বরং শরিয়তের আইনই অটোমেটিক আইন বলে বিবেচিত হবে। দ্রুত সংবিধান সংশোধন করে এ আইন পাশ করে ফেলব যে, শরিয়তের আইনের সাথে সাংঘর্ষিক যেকোনো আইন বাতিল বলে বিবেচিত হবে। এমনটা করলে এতে আর কুফর থাকছে না। সুতরাং এর মাধ্যমে ইসলামি শরিয়ত কায়েম করতে কোনো বাধা নেই।

আমি বলি, বাহ্যত চমকপ্রদ পরিকল্পনা ও শক্তিশালী দলিল মনে হচ্ছে। কিন্তু একটু পর্যালোচনা করে দেখতে তো দোষ নেই। আসুন দেখি, এতে কী কী সমস্যা রয়েছে:

এক: তাদের উক্তি //তবে বর্তমান যুগে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যেহেতু গণতান্ত্রিক নির্বাচন ছাড়া কোনো উপায় নেই//

আমি বলি, এটা চরম এক ভ্রান্তি ও শরিয়া সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফসল। আপনি যখন স্বীকার করলেন, গণতন্ত্র হলো কুফরি তন্ত্র, তাহলে আপনার

উপরিউক্ত মন্তব্য বলে কি এটাই বুঝাতে চাচ্ছেন যে, আল্লাহ উম্মতকে ব্যাপকভাবে এমন এক সংকটে ফেলেছেন, কুফরের পথ মাড়ানো ছাড়া যা থেকে উত্তরণের কোনো উপায় নেই? এমনটা চিন্তা করাও তো আল্লাহর শানে চরম ধৃষ্টতার শামিল।

আপনাদের কাছে ক্ষমতায় যাওয়াটাই মূখ্য বিষয়, নাকি আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা? যদি প্রথমটা হয়ে থাকে, তাহলে আপনার পথ ও পদ্ধতি ঠিক আছে, তবে এটাকে ইসলাম বলে প্রচার করার কোনো অধিকার আপনাদের নেই। করলে তা হবে মুসলমানদের সাথে স্পষ্ট প্রতারণা। আর যদি দ্বিতীয়টিই আপনাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে তো গণতান্ত্রিক নির্বাচন ছাড়াই আল্লাহ নির্দেশিত জিহাদের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এটা শুধু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণই নয়; বরং বর্তমান সময়ের অপ্রকাশিত চরম এক সত্য, তাগুতি মিডিয়ার ষড়যন্ত্রে যার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ অনবগত ও উদাসীন।

দুই: তাদের উক্তি //তাই আমরা এটাকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে ক্ষমতায় যাব।//

আমি বলি, কুফরকে কখন মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা যাবে আর কখন গ্রহণ করা যাবে না, সেজন্য শরয়ি মূলনীতির গ্রন্থগুলোতে বিশদ বিবরণ রয়েছে। শরয়ি ইকরাহ ছাড়া এবং একান্ত বাধ্য না হলে কি কুফরকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার অনুমতি অনুসরণীয় কোনো ফকিহ দিয়েছেন? দিয়ে থাকলে তার নাম, কিতাবের নাম ও উদ্ধৃতি পেশ করুন। আর ইকরাহ ও একান্ত বাধ্য না হলে কুফরকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার অনুমতি না থাকলে বলুন, আপনাদের গণতান্ত্রিক কুফরি নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ইকরাহ পাওয়া গিয়েছে, যদ্দরুন এটা জায়েজ হয়ে যাচ্ছে?

আপনারাই তো বলেন, এটা মন্দের ভালো হিসাবে করছি। এটা আদৌ মন্দের ভালো কিনা, সেটা ভিন্ন একটি

বিষয়। এটা নিয়ে আলাদা পোস্টে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। আপনাদের এ মন্তব্যেই তো প্রমাণ হয়ে যায় , এটা ইকরাহ নয় ; বরং কল্যাণকামিতা বা মাসলাহাত। শুধু কল্যাণকামিতা বা মাসলাহাতের জন্য কি কুফরি মাধ্যম গ্রহণ করার অনুমতি আছে ? আমার জানামতে তো এর জন্য কুফরকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার কোনো সুযোগ নেই। তাহলে আপনারা কীসের ভিত্তিতে এটাকে মাধ্যম বলে বিষয়টি হালকা করার অপচেষ্টা করছেন ???

তিন : তাদের উক্তি //প্রথমেই যেটা আমরা করব , তা হলো, সংসদের কুফরি সিস্টেমকে আমরা উৎখাত করে ফেলব। আর সংসদে শরিয়তের নির্ধারিত কোনো আইন নিয়ে ভোটাভুটি হবে না ; বরং শরিয়তের আইন অটোমেটিক আইন বলে বিবেচিত হবে। এমনটা করলে এতে আর কুফর থাকছে না। //

আমি বলি, এটা জাস্ট আপনাদের অলীক একটি কল্পনা মাত্র , যা কোনোদিনও বাস্তবায়ন হওয়ার নয়। তাছাড়াও আরেকটি কথা বলুন তো , এই যে আইন বা সংশোধন করার কথা বলছেন , এটার জন্যও তো প্রথমে গণতান্ত্রিক কুফরি সিস্টেমেই ভোটাভুটি করতে হবে। এটার জন্যও তো শরয়ি অনুমোদন থাকতে হবে। এখানে কি সে অনুমোদন আছে ? আর এ সংশোধনের নিশ্চয়তাই বা কয়দিনের ? আপনাদের পরে অন্যরা এসে তো এটা আবার পরিবর্তন করে দেবে। বিষয়টি এমন হয়ে গেল না , যে কিছু কাল ইসলামি আইনে দেশ চলবে। আর কিছু কাল কুফরি সিস্টেমে দেশ চলবে ? এটার বিপরীতই কি সুরা কাফিরুন নাজিল হয়নি ? এখানে কি পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়নি যে , কুফর ও ইসলামের মাঝে কোনো আপোষ নেই? আল্লাহর রাসুল সা . কি এ আপোষের মাধ্যমে মক্কায় ইসলাম কায়েম করতে পারতেন না ? তাহলে আপোষহীন ইসলামকে আপনারা আপোষের ইসলাম প্রমাণ করতে চাচ্ছেন কেন ? বিশ্বের কাছে ভুল ও বিকৃত ইসলাম কেন প্রচার করছেন? এটা আপনাদের ইসলাম হতে পারে , আল্লাহ

কর্তৃক রাসুলুল্লাহ সা.-এর ওপর নাজিলকৃত ইসলাম নয়।

চার: তাদের উক্তি //দ্রুত সংবিধান সংশোধন করে এ আইন পাশ করে ফেলব যে, শরিয়তের আইনের সাথে সাংঘর্ষিক যেকোনো আইন বাতিল বলে বিবেচিত হবে।//

আমি বলি, আপনাদের সংবিধান ও গণতন্ত্র বিষয়ক পড়াশোনা খুবই সীমিত মনে হয়। আপনারা এটাও জানেন না, সংবিধানের সব অনুচ্ছেদই সংশোধন করা যায় না। যেমন উইকিপিডিয়ায় বলা হয়েছে:

"এই সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদ সদস্যদের মোট সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হয় যা সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। তবে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭খ তে বলা হয়ছে সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদে যাই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদের বিধানবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হবে।"

সুতরাং আপনারা যদি আপনাদের ভাবনা বাস্তবায়ন করতে চান তাহলে তো গণতন্ত্রই থাকছে না। সেটা তো গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর হলো। গণতান্ত্রিক সিস্টেমে থেকে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কীভাবে এ্যাকশন নিবেন? আদালত, সেনাবাহিনী, জনগণ কেউ কি এটা মেনে নেবে? এর চাইতে তো খিলাফত ঘোষণা করাই অধিক সহজ। এমন অবাস্তব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চিন্তা করেন কীভাবে?

আর গণতন্ত্রের মানসপুত্ররাই বা আপনাদের এমন আইন কেন করতে দেবে? আমেরিকা, ব্রিটেন কি বসে থাকবে ভাবছেন?? আপনাদের কি এমন সক্ষমতা অর্জন

হয়েছে , যদ্বারা আপনি এসব শক্তির মোকাবেলা করতে পারবেন ???

বেশি না , কিছুদিন আগের শুধু মিসরের অবস্থাটাই দেখুন। মুসলিম ব্রাদারহুড আপনাদের চেয়ে অর্থ , কৌশল, সমর্থন , অভিজ্ঞতা সবদিক থেকে শতগুণ শক্তিশালী। কিন্তু গণতান্ত্রিক সিস্টেমে এসে কয়দিন টিকতে পারল ? এক বছরও নয়। কেন ? কারণ, তারাও আপনাদের মতো ভুল চিন্তায় বিভোর ছিল। বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার পর এখন তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারছে। এদের থেকে কি আপনারা শিক্ষা নিবেন না ? যতদিন না কুফরের মূলে আঘাত করবেন , যতদিন না তাদের শক্তি দুর্বল করতে পারবেন , ততদিন যতই সুষ্ঠু নির্বাচন করে ক্ষমতায় আসেন না কেন , এক বছরও টিকতে পারবেন না। তাই এমন অলীক কল্পনা বাস্তবায়নের চিন্তা পরিত্যাগ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সা .-এর নির্দেশিত সঠিক পথে ফিরে আসুন। বিজয় তো আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছে।

মূলত , গণতন্ত্র মুসলিমদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া এমন একটি জঞ্জাল , যা থেকে মুক্ত হওয়া খুব কঠিন। কিন্তু এ লোহার জিঞ্জির যতদিন আমরা ভাঙতে পারব না ততদিন খিলাফাহ নাম সোনার হরিণের দেখাও পাব না।

শেষ একটি আয়াত বলে আলোচনা শেষ করছি। একটু গভীরভাবে খেয়াল করে বারংবার পড়ুন আর ভাবুন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

'ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা কখনো আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না , যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্ম ও রীতিনীতির অনুসরণ করেন। (সুরা বাকারা : ১২০)

ইসলামের নামে চরমোনাইদের ভয়ংকর কিছু তাহরিফ ও তার প্রামাণ্য খণ্ডন :

১ নং মন্তব্য:

চরমোনাইয়ের নায়েবে আমির মুফতি ফয়জুল করিম বলেন
:

বর্তমান জমানায় যেহেতু তলোয়ারের যুদ্ধ, মুখোমুখি যুদ্ধ, এটা এখন অনেকটা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সশস্ত্র বিপ্লব অসম্ভব হয়ে পড়েছে। যেহেতু চৌদ্দশ বছরের আগের অবস্থা, পাঁচশ বছরের আগের অবস্থা, একশ বছরের আগের অবস্থা এক নয়।...এই মুহূর্তে এই জমানায় কেউ যদি মনে করে, আমরা সশস্ত্র বিপ্লব করব, আমি বলব, তুমি সশস্ত্র বিপ্লব করতে পারবে না, তুমি আত্মঘাতী বিপ্লব করতে পারো, তুমি আত্মঘাতী বিপ্লব করতে পারো। এজন্য দেখেননি, যারা এই সশস্ত্র বিপ্লব করতে চেয়েছে, একজনও বাঁচেনি; বরং আমাদের দেশটাকে সন্ত্রাসীকে বানিয়ে তারা এখন জেলখানায় ভোগে আর ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, দুর্নামগ্রস্ত হয়েছে।

খণ্ডন:

এ বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকারান্তরে আপনি ইসলামের অন্যতম একটি ফরজ বিধান ‘কিতাল’কে অস্বীকার করেছেন। আপনি দাবি করেছেন, চৌদ্দশ বছরের আগের অবস্থার সাথে যেহেতু বর্তমান জমানার মিল নেই, তাই এ যুগে চৌদ্দশ বছরের আগের মতো সশস্ত্র জিহাদ তথা কিতালের অনুমতি নেই; বরং এ যুগে এটা করলে নাকি সন্ত্রাসবাদ হবে! অস্ত্রের মাধ্যমে এখন জিহাদ করা নাকি আত্মঘাতী হামলা বলে বিবেচিত হবে!! নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক!

কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের গ্রন্থসমূহে ব্যবহৃত ‘কিতাল’ দ্বারা সশস্ত্র সংগ্রাম বা যুদ্ধ বুঝানো হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে কোনো আলিমের মতানৈক্য নেই। তাহলে কুরআনের যেসব আয়াতে কিতালের কথা এসেছে, সেসব আয়াত কি শুধু ১৪০০ বছর পর্যন্ত কার্যকর ছিল? এর পরে কি এসব আয়াত

[illegible]?

[illegible]???

{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

‘[illegible]’ ([illegible] : [illegible])

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

‘[illegible]’ ([illegible] : [illegible])

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

‘[illegible]

[illegible], [illegible]; [illegible], [illegible]’ ([illegible] : [illegible])

[illegible]???

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ

‘[illegible], [illegible].[illegible]’ ([illegible] : [illegible]/[illegible], [illegible]. [illegible])

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ، حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ

‘[illegible].-[illegible]’ ([illegible] : [illegible]/[illegible], [illegible]. [illegible])

لَا تَبْرَحُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ

‘[illegible], [illegible]’ ([illegible]-[illegible], [illegible] : [illegible]/[illegible], [illegible]. [illegible])

[illegible]. [illegible]. : [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

করে শুনে দেখুন, উনি শুধু কিতালকে অসম্ভবই বলেননি, বরং বলেছেন, যারা এ যুগে সশস্ত্র বিপ্লব বা কিতাল করবে, তারা নাকি আত্মঘাতি হামলা বা সন্ত্রাসবাদ করতে পারবে। এটা নাকি জিহাদ হবে না। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক।

এতে শুধু কিতাল অস্বীকারই করা হয় না; বরং কিতালের ব্যাপারে স্পষ্ট অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যও প্রকাশ পায়। এটাও যদি অস্বীকৃতি না হয়, তাহলে বলা যায়, পৃথিবীতে কেউ কোনোদিন কিতালকে অস্বীকার করেনি। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি ক্লিয়ার হবে।

যেমন দেখুন, ভ্রান্ত ফিরকা আহলে কুরআন বলে, 'হাদিস' শরিয়তের একটি দলিল, তা আমরা মানি। কিন্তু রাসুল সা.-এর ওফাত পরবর্তী সময়ে এতে বিভিন্ন পরিবর্তন ও বিকৃতি চলে আসায় এখন তা মানা সম্ভব নয়। এভাবেই কিন্তু তারা হাদিস অস্বীকার করে, সরাসরি অস্বীকার করার কথা বলে না। তারপরও কিন্তু উলামায়ে কিরাম তাদের নাম দিয়েছেন মুনকিরিনে হাদিস বা হাদিস অস্বীকারকারী।

তাহলে চরমোনাইয়ের পির সাহেব যখন কিতালকে অসম্ভব বলছে, এটাকে সন্ত্রাসবাদের সাথে তুলনা করছে, তখন এটাকে কেন অস্বীকৃতি বলা হবে না? অসম্ভব বলা মানেই তো প্রকারান্তরে এ দাবি করা যে, একসময় কিতালের বিধান থাকলেও এখন তা করা যাবে না। করলে বরং আত্মঘাতী হওয়ার গোনাহ হবে। তাই মুখে যতই বলুক আমি কিতাল অস্বীকার করি না, কিন্তু এটাকে অসম্ভব ও সন্ত্রাসবাদ বলায় বস্তুত এটাকে অস্বীকারই করা হলো। এসব ক্ষেত্রে তো তাগুত ও কাফিররাও কিন্তু এভাবে বলে না যে, ইসলামে জিহাদ বা কিতাল নেই। তারাও এসবের মৌখিক স্বীকৃতি দিয়ে এর এমন অপব্যাখ্যা দাঁড় করায় যে, তা কিতাল অস্বীকারেরই নামান্তর। তাই দলীয় ভক্তির উর্ধ্বে থেকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তার বক্তব্যগুলো শুনলে খুব সহজেই বুঝে আসবে যে, পির

সাহেব তার এসব বক্তব্যের মাধ্যমে কিতালকে অস্বীকার করেছেন।

২ নং মন্তব্য:

চরমোনাইয়ের নায়েবে আমির মুফতি ফয়জুল করিম বলেন
:

আমরা আগেই বলছি আমরা দাওয়াত নিয়ে যাই মানুষের কাছে। আর মানুষ যদি ইসলাম নাই বুঝে তাহলে ইসলামটা কায়েম করব কী? ইসলাম কায়েম করব কী? কী কথা ঠিক না? এজন্য আমরা চাই, আব্বাজানা রহ. বলতেন, আমি নির্বাচন করি না, আমি জিহাদ করি। আমি কী করি? আল্লাহর শোকর এটার বাস্তব নমুনাও আছে। হাজি তোফাজ্জল হোসেন সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি। হোসেন স্প্রিং এর মালিক। হোসেন টায়ারের মালিক। এ যে হোসেন টায়ার দেখেন না? হোসেন স্প্রিং? বহু কোটি কোটি টাকার মালিক। চট্টগামের একজন ব্যবসায়ী। চরমোনাইয়ের খাস মুরিদ ছিল। ফানা ফিশ শায়েখ ছিল। আব্বাজান রহমাতুল্লাহি আলাইহি যা বলতেন, নির্বিঘ্নে মেনে নিতেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন করতেন না। ১৯৯১ সালে আব্বাজান বললেন, তাফাজ্জুল হোসেন সাহেব, - উনার বাড়ি হলো মুন্সিগঞ্জ- আপনি গিয়ে নির্বাচন করেন। বলল, হুজুর, আমার বাড়ি তো মুন্সিগঞ্জ, থাকি আমি চট্টগ্রামে। আমাকে কেউ চিনে না। আমি কী নির্বাচন করব? আব্বাজান বললেন, যান মিয়া, জিহাদের নিয়তে দাঁড়াইয়া যান। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করেননি। উনি চলে গেলেন। যাওয়ার পরে উনি পোস্টার ছাপাইয়া বললেন, ভাই, আমি নির্বাচন করতে আসিনি। হুজুর বলছে, ইসলামের বাক্স নিয়ে জিহাদে শরিক হয়ে যাও। আমি জিহাদ করার জন্য আসছি। ১৯৯১ সাল। তার নিজের প্রতিষ্ঠিত এক মাদরাসার সামনে এরকম নির্বাচনী বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তার বুকের ভিতর পেইন উঠল। তিনি বললেন, আমাকে একটু ভিতরে নিয়ে যাও। ধরাধরি করে তাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো। কালিমা পড়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর পড়ল,

দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল। তাকে দাফন করা হলো। মুন্সিগঞ্জ পদ্মানদী ভেঙে গেছে, আপনারা জানেন। বহু জায়গা ভেঙে গেছে। চার বছর আট মাস পর পদ্মার ভাঙ্গনে যখন তার কবর ভেঙে গেল, দেখা গেল, তার কবরের ভেতর লাশ একেবারে তাজা, একবোরে তাজা।

আমরা নির্বাচন করি না, আমরা জিহাদ করি। আমরা কী করি? এটা নির্বাচন নয়, এটা আমাদের জিহাদ। এই জিহাদে যারা অংশগ্রহণ করবে তারাই হলো মুজাহিদ। এতে যারা খরচ করবন, সময় দেবেন, সবকিছু করবেন, তাদের প্রত্যেকটা সময়, প্রত্যেকটা সেকেন্ড আল্লাহর দরবারে নেকের মধ্যে লেখা হতে থাকবে।

مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانط لا يقتر من صيامه ولا صلاته حتى يرجع المجاهد في سبيل الله

মুজাহিদ যতক্ষণ আল্লাহর রাস্তায় থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের আমলনামায় সওয়াব লেখা হইতে থাকবে। এই মুজাহিদ কোন মুজাহিদ? যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর হুকুমত কায়েম করার জন্য সাধনা করবে তারাই হলো এই মুজাহিদের অন্তর্গত। যারা অন্য কোনো কাজ করার জন্য নামবে তারা এই হাদিসের মেসদাক (প্রয়োগক্ষেত্র) এর মধ্যে পড়তে পারে না। এত সহজ মনে করবেন না। কী, কথা ঠিক না?

খণ্ডন:

এ বক্তব্যের প্রথমে আপনি নির্বাচনকে জিহাদ বলে ঘোষণা দিলেন। তারপর সপক্ষে দলিল দিলেন, একজন প্রার্থী নির্বাচনের প্রচারণার সময় মারা গেলে, চার বছর পর তার কবর খোঁড়া হলে দেখা গেল, তার লাশ পঁচেনি। এরপর সর্বশেষ দাবি করলেন, যারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে, তারাই একমাত্র মুজাহিদ, অন্য কোনো পদ্ধতিতে কাজ করলে তারা মুজাহিদ বলে বিবেচিত হবে না। এজন্য নির্বাচনকালীন ব্যয় হওয়া

প্রতিটি টাকা, সময় ও শ্রম সব জিহাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এখানে প্রথম যে তাহরিফ করলেন, সেটা হলো কুফরি সিস্টেমকে শুধু ভালো নিয়তে ব্যবহারের কারণে জিহাদ বলে দাবি করলেন। আপনি কি জানেন, জিহাদের শরয়ি সংজ্ঞা কী? প্রকৃত অর্থে জিহাদ তো সশস্ত্র সংগ্রামকেই বলে। অর্থাৎ কিতাল ও শরয়ি জিহাদের অর্থ একই। ফুকাহায়ে কিরাম জিহাদের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন এভাবে:

هو بـذل الجهد من المسـلمين في قتـال الكفـار المعانـدين المحاربين والمرتدين والبغاة ونحوهم لإعلاء كلمة الله تعالى

অর্থাৎ সীমলঙ্ঘনকারী যোদ্ধা কাফির বা ধর্মত্যাগী বা বিদ্রোহী বা এ জাতীয় অপরাধীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সশস্ত্র সংগ্রমাকে জিহাদ বলা হয়।

চার মাজহাবের ফকিহ ও মুহাদ্দিস সবাই এমন সংজ্ঞাই বর্ণনা করেছেন। দেখুন–বাদাই্উস সানায়ি: ৭/৯৭, ফাতহুল বারি: ৬/২, মুনতাহাল ইরাদাত: ২/২০৩, আল-ইকনা: ২/৬১, আর–রাওজুল মুরবি: ৪/২৫৩, সুবুলুস সালাম: ৭/৩৩৭, নাইলুল আওতার: ৫/৬, আল-মুগনি: ১৩/১০, আল-মুকনি মাআশ শরহিল কাবির: ১০/১২, আশ-শারহুল মুমতি: ৮/৮

এছাড়াও ফুকাহায়ে কিরাম ও মুহাদ্দিসিনে কিরাম ‘জিহাদের অধ্যায়’ বলে যে শিরোনাম দেন, তাতে কি কখনো দেখেছেন, সশস্ত্র জিহাদ ছাড়া তাতে আভিধানিক বা হুকমি জিহাদের কোনো মাসআলা বা হাদিস বর্ণনা করেছেন? এতে কি স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় না যে, তাঁরা জিহাদ বলতে শুধু সশস্ত্র সংগ্রামকেই বুঝিয়েছেন? সবাই জিহাদ মানে এটাই বুঝেছে। কিন্তু আপনি জিহাদকে এমন এক অর্থে ব্যবহার করে মানুষকে বোকা বানাচ্ছেন, যার সাথে শরয়ি অর্থের কোনো সম্পর্ক নেই।

আপনি বলতে পারেন, এটা শরয়ি অর্থে জিহাদ না হলেও আভিধানিক অর্থে বা হুকমি অর্থে তো জিহাদ ঠিক আছে। তাহলে এতে দ্বীনের বিকৃতি কীভাবে হলো?

আমি বলব, আপনি যখন কোনো বিধানের ব্যাপারে কথা বলবেন, তখন তথায় তার পারিভাষিক বা শরয়ি অর্থই উদ্দেশ্য হয়, আভিধানিক অর্থ নয়। যেমন আপনি বললেন, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরজ। এখানে কেউ যদি এ কথাটি এভাবে প্রচার করে যে, দৈনিক পাঁচবার নিতম্ব দোলানো (নাচানাচি করা) ফরজ, তবে আপনি কি তাকে বিকৃতিকারী বলে অভিহিত করবেন না? অবশ্যই করবেন। কারণ, আভিধানিকভাবে 'সালাত' এর একটি মূলক্রিয়ার অর্থ নিতম্ব দোলানো হলেও এখানে তার আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। আপনি এখানে যে জবাব দেবেন, আমরা আপনার উত্থাপিত কথার জবাবেও তাই-ই বলব। অনুরূপ জিহাদ যদি আভিধানিক অর্থেই নিতে চান, তাহলে তো কুফরের জন্য প্রচেষ্টাকেও তো কুরআনে আভিধানিক অর্থে জিহাদ বলেছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

'পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরিক স্থির করতে প্রচেষ্টা চালায়, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে।' (সুরা লুকমান: ১৫)

তাহলে কুফরের জন্য প্রচেষ্টা করাকে কি আপনি জিহাদ বলবেন? কুরআনে তো এখানে 'জিহাদ' শব্দ ব্যবহার করেছে। তাই শরয়ি মাসআলা বয়ানের জায়গায় আভিধানিক অর্থ প্রয়োগের কোনো অবকাশ নেই।

যদি বলতে চান, দ্বীন কায়েমের জন্য যেকোনো প্রচেষ্টাকে প্রকৃত শরয়ি অর্থে জিহাদ বলা না হলেও হুকমিভাবে তো জিহাদ বলা যেতে পারে।

আমি বলব, প্রথমত সেটার জন্য আপনার চয়িত পন্থাটি শরিয়া অনুমোদিত হতে হবে। আপনি যে গণতান্ত্রিক

নির্বাচনকে হুকমি জিহাদ বলতে চাচ্ছেন, তা তো শরিয়া অনুমোদিত প্রচেষ্টাই নয়। কুফরমিশ্রিত পদ্ধতি কীভাবে দ্বীন কায়েমের পথ হতে পারে!?? শুধু নিয়ত ভালো থাকার কারণে যদি কোনো নাজায়িজ কাজ জায়িজ হতো, তাহলে তো সুপথে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে বেশ্যাখানায় যাওয়া এবং প্রয়োজন হলে তাদের সাথে বিছানায় যাওয়াও জায়িজ হয়ে যাবে। কারণ, কাজ ও পন্থা হারাম হলেও উদ্শ্যে বা নিয়ত তো ঠিক আছে!! এটাই কি আপনার ইসলাম? আপনার শরিয়ত কি এমন কাজের আদেশ বা অনুমোদন দিতে পারে??

দ্বিতীয়ত, হুকমি জিহাদ হলে সেটাকে এত প্রচার ও মানুষকে এটার প্রতি এত আহবান করা হচ্ছে কেন? এটা যে আসল জিহাদ নয়, এ কথা কি আপনার মুখ থেকে একবারও বের হয়েছে? আসল জিহাদের ব্যাপারে নীরব থেকে শুধু আপনার হুকমি জিহাদের জন্য এত জোরপ্রচেষ্টা কেন? আসলটার জন্যই কি আপনার অধিক প্রচেষ্টা থাকা উচিত ছিল না? আগুনে পুড়ে বা পানিতে ডুবে মারা গেলে সে হুকমি শহিদ। তাই বলে কি আপনি আল্লাহর কাছে এ দুআ করতে পারবেন যে, আল্লাহ, তুমি আমাকে আগুনে পুড়িয়ে মারো, আমাকে পানিতে ডুবিয়ে মারো? আপনি কিন্তু এ দুআ করেন না, এমন দুআ কোনো মুমিন করতে পারে না। এখানে দুআ করা হয়, হে আল্লাহ, আমাকে জিহাদের ময়দানে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় শাহাদত দান করুন। কারণ, সবাই জানে যে, এটাই আসল শাহাদত। আর অন্যগুলো হুকমি বা শুধু সান্ত্বনামূলক শাহাদত, আসল শাহাদত নয়।

তৃতীয়ত, আপনি এটা হুকমি জিহাদ বললে আসল জিহাদকে সন্ত্রাসবাদ বলছেন কেন? আপনি আসল জিহাদ করতে পারছেন না, সেটা আপনার সীমাবদ্ধতা। কিন্তু যারা এ কাজ করছেন এবং কাফির ও তাগুতদের জন্য ভীতি সৃষ্টি করছেন, তাদেরকে সন্ত্রাসী বলার কোনো অধিকার আপনার নেই। আপনার জিহাদে তাগুত ভয় পায় না। কারণ, তারা জানে, এটা আসল জিহাদ নয়। এ জিহাদের দ্বারা আপনি তাদের একটি পশমও নাড়াতে

পারবেন না। তাই তাদের পছন্দনীয় এ জিহাদ তারা আপনাকে খুশি মনেই করতে দেবে। কিন্তু আসল জিহাদ যারা করছে, তাদের সামান্য একটি ধুলিকণার সমানও হবে না আপনার জিহাদ। কারণ, তাদের কুরবানি আর রক্তের কারণেই তাগুতের দৃষ্টি আপনার পর্যন্ত এখনও পৌঁছেনি। তাঁরা না থাকলে আজ আপনাদের জান আর মা-বোনদের ইজ্জত ঠিক থাকত কিনা, যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর এসব কোনোমতে ঠিক থাকলেও ইসলামের কোনো বিধান পালন করতে পারতেন না। বৈশ্বিক বিষয়ে খবর না রেখে, বাস্তবতা না বুঝে কিছু মুরিদের সামনে কয়েকটা গরম বক্তৃতা করলেই ইসলাম কায়েম হয়ে যায় না। এর জন্য চাই রাসুলের দেখানো পথে আপনার তপ্ত রক্ত। আপনি রাসুলের সে দেখানো পথেও নেই, আবার তপ্ত রক্ত দেওয়ার ময়দানেও নেই; তাহলে এটা কীসের জিহাদ। এমন নকল জিহাদের বয়ান দিয়ে উম্মতকে বিভ্রান্ত করবেন না। মানুষের আবেগকে পুঁজি করে নিজেদের আখের গোছানোর ফিকির করবেন না। জনসাধারণের ইসলামপ্রিয়তাকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করবেন না। এসব বন্ধ করুন। এবার সত্য জানার সময় চলে এসেছে। হকের আলোয় আপনাদের তাহরিফ বা দ্বীন বিকৃতির বিবরণ প্রকাশ হওয়া শুরু হয়েছে। আল্লাহ আপনাদের সত্যের পথে ফিরে আসার তাওফিক দান করুন।

৩ নং মন্তব্য:

চরমোনাইয়ের নায়েবে আমির মুফতি ফয়জুল করিম বলেন
:

গণতন্ত্র আর নির্বাচন এক জিনিস নয়। গণতন্ত্র আর নির্বাচনের মাঝে আসমান-জমিন পার্থক্য। এ জায়গায় আমরা ভুল ধারণা করি। গণ মানে জনগণ, তন্ত্র মানে আইন। জনগণের আইন। তার মানে বাই দ্যা পিপল, অব দ্যা পিপল, ফর দ্যা পিপল। আর আমরা কী বলতেছি? বাই দ্যা আল্লাহ, অব দ্যা আল্লাহ, ফর দ্যা আল্লাহ। আমি তো আগেই বলেছি, আমি গণতন্ত্র বাস্তবায়ন করতে চাই না। আমাকে নির্বাচিত করো,

আমি ইসলাম বাস্তবায়ন করতে চাই। তো আমি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই, এটা আপনাকে বলছে কে? এটা ভুল থিম। এখানেই মারাত্মক ভুল। বরং বর্তমান জমানায় সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামি হুকুমত কায়েম করা খুবই কঠিন, মহাল, সম্ভব নয়। আমি তো আগেই বলেছি, আমাকে নির্বাচিত করো, আমি কী বাস্তবায়ন করব? ইসলাম। তো আমি গণতন্ত্র বাস্তবায়ন করব, এটা আপনি পেলেন কোথায়? এটা কোথায় পেলেন আপনি? বরং বর্তমান জমানায় সশস্ত্র বিপ্লবর মাধ্যমে ইসলামি হুকুমত কায়েম করা খুবই কঠিন, মহাল, সম্ভব নয়।

খণ্ডন: আপনি গণতন্ত্র আর নির্বাচন এক জিনিসি নয় বলে কী বুঝাতে চাচ্ছেন? এটা তো কমন বিষয় যে, গণতন্ত্র আর নির্বাচন এক জিনিস নয়। আপনার কথা থেকে বুঝা যায়, গণতন্ত্রে কুফরি নীতি থাকায় তা কুফরি ঠিক আছে। কিন্তু নির্বাচনে তো কোনো কুফরি নেই। আর এ নির্বাচনে জেতার পর যেহেতু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে না; বরং ইসলামি হুকুমত কায়েম করা হবে, তাই গণতন্ত্রের মতো নির্বাচনকেও কুফরি বলা ভুল ধারণা।

আমি বলি, এটাও আপনার চরম এক ভ্রান্তি যে, নির্বাচনকে গণতন্ত্রের হুকুম থেকে ভিন্ন কিছু ভাবা। এমনিতে নির্বাচন শরিয়তে নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু নির্বাচন যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়, নির্বাচনে যদি কুফরি তন্ত্রের মিক্স থাকে, তাহলে এটাকে সাধারণ নির্বাচন বলে জায়েজ বলার কোনো অবকাশ নেই। আপনি যখন গণতান্ত্রিক সিস্টেমে নির্বাচনে অংশ নিবেন, তখন তো আপনাকে গণতন্ত্রের সকল রুলস ও নীতিমালা মেনেই মনোনয়ন নিতে হবে। আপনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান বলে তাদের লিখিত স্বীকৃতি দিতে হবে। আপনি গণতন্ত্র রক্ষায় একজন আদর্শ সৈনিক হবেন বলে বক্তৃতাও করতে হবে। এসব কি কুফর নয়? এগুলো কি কুফরকে প্রমোট করা নয়?? বাহ্যক দৃষ্টিতে হলেও এসব কি তাগুতদের পাল্লাকে ভারী করা নয়???

এখানে আপনার জন্য কুফরে লিপ্ত হওয়া কেন জায়েজ হবে? শরিয়তের কোন মূলনীতির আলোকে আপনার জন্য এখানে কুফরে লিপ্ত হওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে? শুধুমাত্র ইকরাহ বা অস্ত্রের মুখে বাধ্য করা হলেই তো কুফরে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। আপনাকে এখানে কে অস্ত্রের মুখে কুফরে লিপ্ত হতে বাধ্য করেছে? ভালোর মন্দ নীতি যে এখানে প্রযোজ্য নয়, তা আমি পূর্বে আরেকটি লেখায় দলিলভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট করেছি।

অতএব, গণতন্ত্র আর নির্বাচনকে ভিন্ন প্রমাণ করে আপনি উভয়ের বিধান আলাদা করার যে পাঁয়তারা করেছিলেন, তা সফল হলো না। মুল কুফর হলে তার শাখাও তো কুফরই হবে। আপনি গণতন্ত্রকে কুফর বলে স্বীকার করছেন, অথচ তার শাখা গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে কুফর বলে স্বীকার করছেন না; বরং জায়েজ বলছেন! বড় আজিব আপনার ফতোয়া!!

আর আপনি গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দিলেন, তা তো গণতন্ত্র নয়। এটা আপনার নিজস্ব একটি সংজ্ঞা। আপনি যখন গণতন্ত্রের রুলস ভেঙে আপনার মতো করে রাষ্ট্র চালাবেন, তখন আপনি কী করে ভাবলেন যে, গণতন্ত্রের তল্পীবাহকরা আপনাকে ছেড়ে কথা বলবে? আমেরিকা, ইংল্যান্ড কেন বসে থাকবে? ভারত কেন আপনার কথা মেনে নেবে? আপনি কি এদের মোকাবেলা করে আপনার রাজত্ব টিকিয় রাখতে পারবেন? কক্ষনো পারবেন না। একদিনও পারবেন না। মুসলিম ব্রাদারহুড সর্বদিক থেকে আপনাদের চেয়ে যোজন যোজন এগিয়ে ও শক্তিশালী। তারা গণতন্ত্রের রুলস ভাঙার ঘোষণাও দেয়নি। জাস্ট কয়েকটা আইন ইসলামি করেছিল। একবছরও টিকল না। আপনি যদি মনে করেন, কয়েক বছর শাসন করে ভেতরে ভেতরে নিজেদের শক্তি অর্জন করে নেব। তো আমি বলব, আপনি এটা করতে পারবেন না। কারণ, এটা গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র নয়। আপনাকে দেশের আইন মেনেই সব করতে হবে। গোপনে তেমন কিছুইকরতে পারবেন না। তাছাড়াও আপনি যে কয়েক বছর এ প্রস্তুতি নিবেন, সে কয়েক বছর তো

আপনাকে কুফরি সিস্টেমেই শাসনকার্য পরিচালনা করতে হবে। ইসলামি রাষ্ট্র বানানোর উদ্দেশ্যে আপনার জন্য কি এভাবে লাগাতার কুফরি জারি রেখে, শত কুফরের আইনে সম্মতি জানিয়ে, কুফরের মধ্যে দিনরাত কাজ করার অনুমতি আছে? এভাবে আদৌ হবে না, এটা আপনিও বুঝবেন। এটার জন্য আপনার আইনাস্টাইন হওয়ার প্রয়োজন নেই। এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে আপনাদের এসব লম্পঝম্প আখেরে তো সব বৃথাই যাবে। আর আপনি যে সশস্ত্র সংগ্রামকে অসম্ভব ভাবছেন, তা অনেক আল্লাহর বান্দা সম্ভব করে দেখাচ্ছেন, যারা আপনার মতো এত হিকমতি আর দুর্বল চিত্তের অধিকারী নয়। অতএব, আপনার এসব অলীক কল্পনার ফানুস দিয়ে আপনার কুফরি তন্ত্রকে ইসলাম কায়েমের মাধ্যম বানানোর অনুমোদন কিছুতেই হতে পারে না।

৪ নং মন্তব্য:

চরমোনাইয়ের নায়েবে আমির মুফতি ফয়জুল করিম বলেন
:

আর সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য শর্ত হলো স্বকীয়তা এবং সতন্ত্রতা, গোপনীয়তা। আর বর্তমান জমানায় গোপনীয়তা রক্ষা করা খুবই কঠিন, জটিল এবং মহাল। এটা সম্ভব নয়।

এজন্য দেখেন, গোটা দুনিয়ায় বর্তমানে সশস্ত্র বিপ্লব টিকেনি, টিকতে পারে না। এজন্য পূর্ব বাংলাদেশ কমনিস্ট পার্টি, সর্বোহারা সাকসেস হতে পারেনি। বরং আমাদের দেশের যে সমস্ত সন্ত্রাসরা ইসলামকে সামনে নিয়ে ইসলামকে কলুষিত করার চেষ্টা করেছে, তারাও টিকতে পারেনি। তাদের বাচ্চা ও পোনা ডিমসহ সব এরেস্ট হয়ে গেছে।

তাহলে কি ইসলাম বন্ধ হয়ে যাবে? না, ইসলাম বন্ধ হবে না। মোকাবেলায় আরেকটা চলে আসবে। সেটা কী? বর্তমানে সবচেয়ে সুন্দর পদ্ধতি হলো নির্বাচন।
নির্বাচনের চেয়ে ভালো কোনো পদ্ধতি দেখছি না।

ইখতিলাফ নেই। সমস্ত উলামায়ে কিরামের ইজমা হয়ে গেছে। আপনি ইখতিলাফ করছেন কেন? পাকিস্তানের উলামায়ে কিরামের ইজমা, ভারতের উলামায়ে কিরামের ইজমা, বাংলাদেশের উলামায়ে কিরামের ইজমা। গোটা দুনিয়ার উলামায়ে কিরামের এখন নির্বাচনের ব্যাপারে ইজমা হয়ে গেছে।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, জিহাদ শব্দের অর্থই তো ‘আল-জিহাদু হুয়াদ দুআউ ইলা দ্বীনিল হক’। জিহাদ তো দ্বীনে হকের দিকে দাওয়াত দেওয়া। আর নির্বাচনের মাধ্যমে যত সুন্দরভাবে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া যায়, এত সুন্দর পদ্ধতি বর্তমানে দ্বিতীয় কোনোটি নেই। ঘরে ঘরে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে দাওয়াত দেওয়া যায় নির্বাচনের মাধ্যমে।

খণ্ডন:

মানতেকের কিতাবে পড়ানো হয়, “জগত পরিবর্তনশীল। আর সব পরিবর্তনশীল বস্তু ধ্বংসশীল। অতএব বিশ্ব ধ্বংসশীল।” সুন্দর যুক্তি। কারণ, কথাগুলো বাস্তব। এর ভিত্তি আছে। তাই ফলাফলও সঠিক এসেছে। আপনিও সম্ভবত এ ধরনের যুক্তি প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। প্রথমে বলেছেন, সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য স্বকীয়তা ও গোপনীয়তা শর্ত। আর বর্তমান যুগে স্বকীয়তা ও গোপনীয়তা সম্ভব নয়। অতএব বর্তমানে যুগে সশস্ত্র সংগ্রামও সম্ভব নয়। বাহ! এত সুন্দর যুক্তি!! এত মানতেকের প্রয়োগ!!!

প্রথম কথা হলো, আপনি কোথায় পেয়েছেন যে, সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য স্বকীয়তা ও গোপনীয়তা শর্ত। এটা ফিকহের কোন কিতাবে আছে? কোন ফকিহ বলেছেন? নাকি এটা আপনার বানানো শর্ত? আপনার বানানো শর্ত হয়ে থাকলে এটাকে মানুষের কাছে শরিয়তের শর্ত বলে প্রচার করছেন কেন? এটা কি স্পষ্ট ধোঁকাবাজি নয়??

দ্বিতীয়ত, আপনি নিজের দাবির পক্ষে দলিল দিয়েছেন যে, গোটা দুনিয়ায় বর্তমানে নাকি

সশস্ত্র বিপ্লব টিকেনি এবং টিকতে পারে না। এটা বলে আপনার নিজের মূর্খতা প্রকাশ না করলেও পারতেন। নিজেদের ব্যর্থতা অন্যদের ওপর চাপাচ্ছেন কেন?? আপনাকে কে বলল, পৃথিবীর কোথাও সশস্ত্র সংগ্রাম নেই বা থাকলেও টিকে থাকতে পারছে না। তাহলে বর্তমান বিশ্বের প্রায় পঞ্চাশ লক্ষাধিক বর্গ কিলোমিটার আয়তনের ভূমি যেসব সশস্ত্র যোদ্ধারা নিয়ন্ত্রণ করছে, সেগুলো কি পৃথিবীর মানচিত্রের বাহিরে? এসব যোদ্ধাদের উত্থান তো বেশিদিন হয়নি, মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ বছর হলো। এরই মধ্যে তারা দুনিয়ার তাবৎ তাগুতি শক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বিশাল বিশাল ভূখণ্ডে ইসলামি শাসন চালু করেছে। আর আপনাদের ইসলামি গণতন্ত্রের যাত্রার আজ প্রায় শতবর্ষ হতে চলল। আজ পর্যন্ত কি পৃথিবীর এক বর্গকিলোমিটার ভূমিতেও ইসলামি শাসন কায়েম করে দেখাতে পেরেছেন? এটা তো চরম ব্যর্থতা ও নিচু মানসিকতার পরিচায়ক যে, নিজেদের ভুল স্বচক্ষে দেখার পরও তা থেকে ফিরে তো আসছেনই না; উল্টো যারা সহিহ মানহাজে কাজ করে এগিয়ে যাচ্ছে, তাদেরকে সন্ত্রাসী ও ব্যর্থ বলে নিজেদের লজ্জা ঢাকবার চেষ্টা করছেন!! ধিক্কার জানাই এমন মানসিকতাকে। ঘৃণা করি এমন জঘন্য অপবাদকে। সত্যের আলো দেখেও যারা না দেখার ভান করে, তাদের চেয়ে হতভাগা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কেউ নেই।

এরপর আপনি বিশ্ব প্রেক্ষাপটকে বাংলাদেশের সর্বোহারা, কমিউনিস্ট ইত্যাকার বাহীনির সাথে মিলিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, এসবই হলো সন্ত্রাসবাদ এবং এ পথে কোনোদিন সফলতা আসবে না। আপনার দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তি এত দুর্বল, আপনার এসব বয়ান না শুনলে হয়ত কোনোদিনও জানা হতো না। এটা ঠিক যে, বাংলাদেশে যারা কাজ করেছে, তাদের কৌশলগত কিছু ভুল ছিল, তাই বলে আপনি তাদের প্রতি ঘৃণার যে বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন, তা সত্যিই ঘৃণাযোগ্য। তারা কৌশলগত কিছু ভুল করলেও আপনাদের মতো কুফরি তন্ত্রকে বেছে নেয়নি। আর

বৈশ্বিক একটি আন্দোলনকে আপনি বিচ্ছিন্ন দুএকটি ঘটনা দ্বারা পরিমাপ করার অধিকার রাখেন না। করলে তা হবে আপনার চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আল্লাহ আপনাকে হিদায়াত দিন।

এরপর আপনি সশস্ত্র জিহাদকে আপনার যুক্তিতে অসম্ভব প্রমাণ করে দাবি করলেন যে, বর্তমান সময়ে নির্বাচন হলো সবচেয়ে সহজ ও উত্তম পদ্ধতি। আর এ মাসআলায় নাকি উম্মতের ইজমা হয়ে গিয়েছে।

আপনার এসব হাস্যকর উক্তির খণ্ডন করার আদৌ প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। ইজমা কাকে বলে, তা কি জানেন? গোটা দুনিয়ার ইজমা বলতে আপনি কাদের কথা বলতে চাচ্ছেন? কয়েকটি মাদরাসার ফতোয়া পেলেই ইজমা হয় যায়? আপনি কি জানেন, আরব, মিশর, জর্ডান, ইরাক, সিরিয়াসহ ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশেরও অসংখ্য প্রথিতযশা প্রাজ্ঞ উলামায়ে কিরাম রয়েছেন, যারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে নাজায়িজ বলেন? আপনি নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম নিয়ে বলতে পারতেন যে, তারা এ ব্যাপারে এমন ফতোয়া দিয়েছে। তা না করে আপনি আপনার মতের পক্ষে হওয়ায় আংশিকের ফতোয়াকে সবার ফতোয়া বলে অপপ্রচার করছেন! এটাই কি আপনার ইলমি আমানত? এমন ডাহা মিথ্যারোপ বা অজ্ঞতাসূচক মন্তব্য করে নিজের প্রতি কেন জুলুম করছেন? এসব মিথ্যারোপ কবে বন্ধ হবে?

শেষে আপনার বানানো জিহাদের সংজ্ঞা ছুড়ে নিজের মত প্রমাণের চেষ্টা করলেন। আপনি জিহাদের এ সংজ্ঞা কোথায় পেয়েছেন? শুধু দ্বীনে হকের দিকে দাওয়াত দিলেই জিহাদ হয়ে যায়? নাকি এখানে যুদ্ধের শর্ত আছে? ফিকহের কিতাব কখনো খুলে দেখেছেন? সংজ্ঞা না জেনে শরিয়তের কোনো বিধানের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা কি দ্বীনের সুস্পষ্ট বিকৃতি নয়?

ফুকাহায়ে কিরাম জিহাদের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন এভাবে:

هو بـذل الجهد من المسـلمين في قتـال الكفـار المعانـدين المحاربين والمرتدين والبغاة ونحوهم لإعلاء كلمة الله تعالى

অর্থাৎ সীমলঙ্ঘনকারী যোদ্ধা কাফির বা ধর্মত্যাগী বা বিদ্রোহী বা এ জাতীয় অপরাধীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সশস্ত্র সংগ্রমাকে জিহাদ বলা হয়।

চার মাজহাবের ফুকাহা ও মুহাদ্দিস সবাই এমন সংজ্ঞাই বর্ণনা করেছেন। দেখুন –বাদাই্উস সানায়ি : ৭/৯৭, ফাতহুল বারি : ৬/২, মুনতাহাল ইরাদাত : ২/২০৩, আল-ইকনা : ২/৬১, আর –রাওজুল মুরবি : ৪/২৫৩, সুবুলুস সালাম : ৭/৩৩৭, নাইলুল আওতার : ৫/৬, আল-মুগনি : ১৩/১০, আল-মুকনি মাআশ শরহিল কাবির : ১০/১২, আশ-শারহুল মুমতি : ৮/৮

এছাড়াও ফুকাহায়ে কিরাম ও মুহাদ্দিসিনে কিরাম ‘জিহাদের অধ্যায়’ বলে যে শিরোনাম দেন, তাতে সবাই সশস্ত্র জিহাদের আলোচনাই আনেন। এতে অন্যসব হুকমি বা আভিধানিক জিহাদের আলোচনা আনেন না। এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে একটু পূর্বে খণ্ডন করা হয়েছে।

৫ নং মন্তব্য :

চরমোনাইয়ের নায়েবে আমির মুফতি ফয়জুল করিম বলেন :

গণতন্ত্র বেসিক একটি আদর্শ। একটা নীতি। যার মূল থিম হলো বাই দ্যা পিপল, অব দ্যা পিপল, ফর দ্যা পিপল। আর নির্বাচন হলো, নেতা নির্বাচনের পদ্ধতি। নেতা নির্বাচনের পদ্ধতি আর গণতন্ত্র এক জিনিস নয়। মনে রাখতে হবে ক্ষমতায় আসার প্রক্রিয়া পদ্ধতি যদিও এক হয়, কিন্তু উদ্দেশ্য এক হয় না। দেখেন, হুজুর পাক সা. মাঠে আসছেন, আবু জাহিলও মাঠে আসছে। আমার নবির ঘোড়া ছিল, আবু জাহিলেরও ঘোড়া ছিল। আমার নবির উট ছিল, আবু জাহিলেরও উট ছিল। আমার নবির তলোয়ার, আবু জাহিলের তলোয়ার, আমার নবির পক্ষের লোকের

রক্তক্ষরণ হয়েছে, আবু জাহিলেরও রক্তক্ষরণ হয়েছে। আমার নবির পক্ষের লোক শাহাদত বরণ করেছে, আবু জাহিলের লোক মারা গেছে। বাহ্যিক দিক সমান। যুদ্ধ সমান, সব সমান। কিন্তু একটাকে সন্ত্রাসবাদ আর অন্যটাকে সন্ত্রাসবাদ বলি কেন? কারণটা কী? বাহ্যিক তো সমান। ক্ষমতায় যাওয়ার পদ্ধতি প্রক্রিয়া সমান হয়। মুসা আ.-এর সাথে ফেরাউনের যুদ্ধ সমান, নমরুদের সাথে নবি ইবরাহিমের যুদ্ধ সমান। তালুত জালুতের যুদ্ধ সমান হয়। হুকুমত কায়েম করার পদ্ধতি সবসময় এক হয়, উদ্দেশ্য এক হয় না।

আমরা অনেকেই মনে করি, নির্বাচনটা কুফরি, অমুকের পদ্ধতি। আরে ভাই, পদ্ধতি যেকোনোটা যার তার থেকে আসতে পারে। হিন্দুর তলোয়ার এটা, এই তলোয়ারটা আবু জাহিলের। এখন আবু জাহিলের তলোয়ার দিয়ে কোনো মুসলমান যদি কাউকে মারে, তাহলে সে কি সওয়াব পাবে না?

খন্দক। খন্দকের এ প্রক্রিয়াটি কার? পারস্যের, মাজুসিদের। এটা ওহির মাধ্যমে হয়নি। তো অগ্নিপূজকদের পদ্ধতি অবলম্বন করলে যদি ফজিলত হতে পারে, সেটা ইসলাম হতে পারে, তাহলে এখন যে পদ্ধতিটি ইসলামি হুকুমত কায়েম করে বা যেকোনো গণতন্ত্র বা সেকুলারের হুকুমত কায়েম করে, পদ্ধতি একই হয়, উপরে ওঠার সিঁড়ি একটাই, কিন্তু উপরে কামরা একটা নয়। একটা হলো সিনেমা, আর একটা হলো মসজিদ। তবে উপরে ওঠার পদ্ধতি একটাই। এখন আপনি সিনেমায়ও যেতে পারেন, মসজিদেও যেতে পারেন। যদি মসজিদে যাওয়ার জন্য উপরে ওঠেন, সওয়াব হবে, আর যদি সিনেমায় যাওয়ার জন্য ওঠেন, গোনাহ হবে।

আপনি বলতে পারেন, হুজুর, তাহলে আপনি এই গণতন্ত্রের এই দেশে? আরে ভাই, আপনি তো গণতন্ত্রের এই দেশেই আছেন। আপনি বিবাহ করছেন কোন আইনে? আপনার মাদরাসা চলে কোন আইনে? আপনার মসজিদ চলে কোন আইনে? আপনি যে কেসে পড়ছেন, কোন

আইনে চলে? আপনি মেয়ে বিবাহ দিয়েছেন কোন আইনে ? আপনার সব গণতন্ত্র , তখন গণতন্ত্রের কোনো প্রশ্ন আসে না। কিন্তু যখনই নির্বাচন আসে , তখনই এই প্রশ্ন করেন কেন ? এই প্রশ্ন আপনার নয় , এ প্রশ্ন ইহুদি এবং হিন্দুদের , নাস্তিকদের। কারণ হলো, তুমি তো গণতন্ত্রের মধ্যেই আছ। সেখানেই তুমি থাকো। এই প্রশ্ন তোমাকে ক্ষমতায় যাওয়ায় বাধা সৃষ্টি করে না। কিন্তু তোমাকে এই প্রশ্ন ক্ষমতায় যাওয়ায় বাধা সৃষ্টি করবে। এজন্য এখানে এসে ওরা বলে , এটা গণতন্ত্র , এটা গণতন্ত্র। বলি , এটা গণতন্ত্রের মাতাহাতে। আমরা সবাই গণতন্ত্রের মাতাহাতে। এদেশে মাদরাসা -মসজিদ, এদেশে বিবাহ -শাদি , কেস-কাচারি , আমি। আমার প্রাইম মিনিস্টার কে ? শেখ হাসিনা। আমার অর্থমন্ত্রী কে ? আবুল মাল আব্দুল মুহিত। কাজেই আমি তো এখানেই আছি। গণতন্ত্রের মাঝখানে। এখান থেকে আমার বের হওয়ার সুরত কী ? বরং আমি বের হতে চাই , তুমি বের হতে চাও না। আমি বলি , এটা পদ্ধতি। ক্ষমতায় যাওয়ার পদ্ধতি এক হয়। যদি উদ্দেশ্য ভিন্ন হয় , তাহলে আমারটা জিহাদ হবে। আর ওদের উদ্দেশ্য ভিন্ন , ওরা টেরোরিস্ট , ওদেরটা হবে টেরোরিজম।

খণ্ডন : এ মন্তব্য করে নিজের মূর্খতার সব ডালা খুলে দিলেন ! আপনার ব্যাপারে এমন কথা বলতাম না। কিন্তু আপনার যুক্তি আর কিয়াসের যে অবস্থা , যুক্তিদের বাকশক্তি থাকলে হয়ত তারাও হেসে ফেলত। এমন প্রশ্ন কিছু মূর্খরা করে থাকে যে , আপনি এত ইহুদি , খ্রিষ্টানদের বিরোধিতার কথা বলেন, তাহলে তাদের আবিস্কৃত মোবাইল , ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহার করেন কেন ???

আপনার যুক্তি হলো , যেহেতু কাফিররা যে অস্ত্র ব্যবহার করবে, মুসলমানদেরও সে অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি আছে , তাহলে কাফিররা যখন আমাদেরকে নির্বাচন দিয়ে মোকাবেলা করবে , তখন আমরাও তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচন দিয়ে মোকাবেলা

করব। তারা তলোয়ার ব্যবহার করলে যেমন আমরা তলোয়ার ব্যবহার করি, তারা ঘোড়া ব্যবহার করলে যেমন আমরা ঘোড়া ব্যবহার করি, তারা মাঠে আসলে যেমন আমরা মাঠে আসি, ঠিক তেমনই তারা নির্বাচন করলে আমরাও নির্বাচন করে তাদের মোকাবেলা করব। আপনি উভয়ের মাঝে পার্থক্যের মূল পয়েন্টটি নির্ধারণ করেছেন নিয়ত বা উদ্দেশ্য। তারা যেহেতু কুফর প্রতিষ্ঠার জন্য এসব মাধ্যম ব্যবহার করে, তাই তাদের কাজ সন্ত্রাসবাদ। আর আমরা এসব ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করছি, তাই এটা ইসলামি এবং আমাদের সবকিছ জিহাদ।

আমি বলি, আপনি মূল পয়েন্ট ভুলে কোথা থেকে কোথায় চলে গেছেন, না আপনি বুঝছেন আর না আপনার অন্ধ ভক্তরা তা উপলব্ধি করতে পারছে। আমাদের মূল পয়েন্ট ছিল, নির্বাচন করলেও এ থেকে কুফর এখনও দূর হয়নি। এতে কুফর মিশে আছে। অস্ত্র ব্যবহারকে তো কেউ কুফর বলেনি। যেটা কুফর নয়, সেটার সাথে যেটা কুফর সেটাকে কেন মেলাচ্ছেন?

আপনার কথা থেকে বুঝা যায়, কাফিররা যে মাধ্যম ব্যবহার করে আমাদের মোকবেলা করবে আমরা সে মাধ্যম ব্যবহার করেই তাদের প্রতিরোধ করব। তাহলে কাফিররা সুন্দরী নারী ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের মোকাবেলা করলে কি আমরাও তাদের বিরুদ্ধে সুন্দরী মুসলিম নারী ব্যবহার করে মোকাবেলা করব? এতে কি এসব নারীরা জিহাদের সওয়াব পাবেন? এটা কি জায়িজ হবে? যদিও এখানে ব্যভিচার উদ্দেশ্য নয়; বরং শত্রপক্ষের মোকাবেলা ও কৌশল জেনে নেওয়া উদ্দেশ্য হয়। এ ব্যাপারে হয়ত আপনিও বলবেন, না, এভাবে মোকাবেলা করা জায়িজ নয়। কারণ, ব্যভিচার পরিষ্কার হারাম। তো এখানে যদি ইসলামের স্বার্থে হলেও মুসলিম নারীদের ব্যবহার করা জায়িজ না হয় তাহলে ইসলামের স্বার্থে কুফরে লিপ্ত হওয়া কী করে জায়িজ হবে? এটা তো আরও কঠিন, আরও মারাত্মক। কারণ, সেটা ছিল হারাম, আর এটা তো কুফর। সুতরাং

আপনার এ মূলনীতি ‘নিয়ত ঠিক থাকলে কাফিরদেরকে যেকোনো মাধ্যম দিয়ে মোকাবেলা করা যায়’ স্পষ্ট ভুল ও চরম এক ভ্রান্তি।

এরপর আপনি বোকার মতো কিছু প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন। বলেছেন, আমাদের দেশের সবই তো গণতান্ত্রিক আইনে হয়। বিবাহ-শাদি, মসজিদ-মাদরাসা, কেস-কাচারি ইত্যাদি। এরপর বলেছেন, যারা নির্বাচনের সময় গণতন্ত্রের ব্যাপারে কথা বলে, এটাকে কুফরি মতবাদ বলে প্রচার করে, তাদেরকে আপনি বলছেন, এটা নাকি ইহুদি ও হিন্দুদের প্রশ্ন। এটা কোনো মুসলমানের প্রশ্ন হতে পারে না।

আমি বলি, বিষয় বরং উল্টো। যারা গণতন্ত্রকে কুফরি এবং এতে শরিক হওয়াকে নাজায়িজ মনে করে, তাদের দলিলভিত্তিক জবাব না দিয়ে তাদের প্রশ্নকে ইহুদি-নাসারার প্রশ্ন বলার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে? এটা আবার ইহুদিদের কোনো চাল নয় তো? আমি এমন সন্দেহ করতেই পারি। কারণ, আপনাকে যখন কোনো মুমিন কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে প্রমাণ করে দেবে যে, এটা কুফরি, তখন আপনি পারলে কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে তার বক্তব্য খণ্ডন করে নিজের মতকে প্রমাণ করতে পারেন। এ অধিকার আপনার অবশ্যই আছে। কিন্তু আপনি তা না করে উল্টো তার প্রশ্নকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে দিচ্ছেন। তার নসভিত্তিক আপত্তিকে আপনি বিধর্মীদের আপত্তি বলে প্রচার করছেন! তাহলে তো আপনার ব্যাপারেই এ সন্দেহ অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। আল্লাহ আমাদের এমন জঘন্য মন্তব্য করা থেকে হিফাজত করুন। শেষে আবারও নিয়তকে মূল বানিয়ে যেকোনো মাধ্যম গ্রহণ করার যুক্তি দেখিয়েছেন, যা পূর্বে একাধিকবার খণ্ডন করা হয়েছে।

আর গণতান্ত্রিক দেশে থাকার দ্বারা কি গণতন্ত্র মেনে নেওয়া হয়ে যায়? তাহলে কি দারুল হরবে মুসলিমদের থাকার অনুমতি নেই? তারা কি দারুল হরবে থাকে না?তারা দারুল হরবে থাকে এবং তাদের

দেওয়া সুবিধা ভোগ করে বলেই কি তাদের কুফরের স্বীকৃতি দেওয়া ??? ফিকহের কিতাবে তো এর ভূরিভূরি নজির রয়েছে। আপনি এমন প্রশ্ন করে কী বুঝাতে চাইলেন ? নিজের মূর্খতা প্রকাশ করলেন নাকি বাচ্চাদের মতো করে অদ্ভুত কিছু প্রশ্ন করতে চাইলেন ?!! এভাবে কথা বলে কী যে বুঝাতে চান, আশ্চর্য লাগে !! আর আপনার মুরিদরাও সব গোগ্রাসে গিলে নেয় ! গলায় এতটুকুও আটকে যায় না !! আল্লাহর কাছে আমরা এমন মূর্খতা থেকে পানাহ চাই।

৬ নং মন্তব্য :

চরমোনাইয়ের নায়েবে আমির মুফতি ফয়জুল করিম বলেন :

আজকে আপনি যদি হাতপাখা প্রতীকে ভোট দেন, তাহলে ভোটটা পাবে আল্লাহর নবি। যদি আপনি নৌকা মার্কায় ভোট দেন, ভোটটা পাবে বর্তমান প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা। আপনি যদি ধানের শীষে ভোট দেন, তাহলে ভোটটা পাবে খালেদা জিয়া। আপনি যদি অন্য প্রতীকে ভোট দেন, ভোট পাবে তাদের নেতা। আর যদি আপনি হাতপাখায় ভোট দেন, হাতপাখায় ভোট দিলে ভোট পাবে ইসলাম এবং আল্লাহর নবি।

খণ্ডন :

বস্তুত যারা তাহরিফ করে, তাদের মুখের লাগাম আল্লাহ খুলে দেন। আর এর দরুন তাদের মুখ দিয়ে এমন সব কথা বের হয়, যা শুনে কাফিররাও অবাক হয়ে যায়। এভাবেই একসময় সে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়।

আপনি এখানে দাবি করলেন, আপনার হাতপাখায় ভোট দিলে নাকি ইসলাম ও রাসুল সা.-কে ভোট দেওয়া হবে। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। আমি মনে করি, এমন কথা শুনে তো খোদ চরমোনাইয়ের অন্ধ মুরিদদেরও হুঁশে আসা উচিত ছিল। ইসলাম ও রাসুল সা.-এর শানে এমন জঘন্য মন্তব্য করায় আমি মনে করি, আপনার প্রকাশ্যে তাওবা করা আবশ্যক। এটা চরম

গোস্তাখি। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের স্বার্থে আপনারা ইসলাম ও রাসুল সা .-কে পর্যন্ত ছাড় দিলেন না ! আপনি শুধু আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে চান , এতটুকুর কারণেই আপনাকে ভোট দেওয়া মানে ইসলাম ও রাসুল সা .-কে ভোট দেওয়া হয়ে যাচ্ছে ??? তাহলে আপনার কথানুসারে তো জামাতে ইসলামিকে ভোট দেওয়া মানেও তো ইসলাম ও রাসুল সা .-কে ভোট দেওয়া হবে ! জমিয়তে ইসলামকে ভোট দেওয়া মানেও তো ইসলাম ও রাসুল সা .-কে ভোট দেওয়া হবে !! খিলাফত আন্দোলনকে ভোট দেওয়া মানেও তো ইসলাম ও রাসুল সা .-কে ভোট দেওয়া হবে !!! মানুষ কি এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে না ? এসব কী শুরু করছেন ?? এমন কথা তো ইসলামি গণতন্ত্রের দাবিদার অন্য দলের লোকেরাও কোনোদিন বলতে দুঃসাহস দেখায়নি ! এমন জঘন্য উক্তি ইসলামের ইতিহাসে খুবই বিরল। আল্লাহর কাছে এমন ব্যক্তিবর্গ ও তাদের বিকৃতি থেকে পানাহ চাই।

দ্বিতীয়ত , আল্লাহ ও তার রাসুল সা .-এর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা উদ্দেশ্য হওয়ায় যদি আপনাকে ভোট দেওয়া মানে ইসলাম ও রাসুল সা .-কে ভোট দেওয়া হয় , তাহলে তো নৌকা বা ধানের শীষে ভোট দিলে বর্তমান ব্যক্তি ভোট পাওয়ার কথা ছিল না , আপনার এখানে বলা উচিত ছিল , তাদের ভোট দেওয়া মানে আব্রাহাম লিংকনকে ভোট দেওয়া। অথচ আপনি তা না বলে বর্তমান প্রার্থীদের নাম বললেন। কেন ? কেন এমনটা করলেন?? মানুষের ইসলামপ্রিয়তা দিয়ে বানিজ্য করতে চাচ্ছেন ? এজন্যই তো মানুষ আপনাদের ডাকে সাড়া দিতে চায় না। তারা জানে , আপনারা ইসলামের জন্য নয় , নিজদের স্বার্থে ভোট চাইছেন। দ্বীনের এত তাহরিফ করলে সাধারণ মানুষও আপনাদের চাতুরতা বুঝে ফেলে। আপনাদের মতো এমন অজ্ঞতাপূর্ণ ও কাঁচা ধোকাবাজি কোনো গণতান্ত্রিক দলই করে না। তারাও বোঝে , এসব ফাউল কথা। অথচ আপনি তথাকথিত ইসলামি দলের প্রতিনিধিত্ব করেও এ সাধারণ জ্ঞানটুকু রাখেন না ! আজব আপনাদের রাজনীতি!! আজব আপনাদের কথাবার্তা ও স্লোগান !!!

তৃতীয়ত, আপনি ইসলাম ও রাসুল সা.-কে ভোট দেওয়ার কথা বললেন। এতে কত বড় ক্ষতি হলো, তা কি কখনো কল্পনা করেছেন? আপনি হারলে বিরোধীরা বলবে, ইসলাম ও রাসুল সা. হেরে গেছে। নাউজুবিল্লাহ। তাদের মুখে এমন নিকৃষ্ট কথা বের হওয়ার উৎস হলেন আপনি। আপনার কারণেই তারা ইসলাম ও রাসুল সা.-কে নিয়ে অশোভনীয় কথাবার্তা বলার সুযোগ পেল। আপনি এর দায় কোনোভাবেই এড়াতে পারেন না; যতক্ষণ না প্রকাশ্যে তাওবা করেন।

চতুর্থত, আপনি কি নিশ্চিত যে, আপনি ক্ষমতা পেলে পরিপূর্ণ আল্লাহ ও তার রাসুল সা.-এর নির্দেশনা অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারবেন? আপনি কি আপনার ব্যাপারে পূর্ণ আস্থাশীল? যদি বলেন, নিশ্চিত নই, আমি চেষ্টা করব, তাহলে আপনি এমন কথা বললেন কেন, যে ব্যাপারে আপনার ওপর আস্থা রাখা যায় না? আপনি কেন এটাকে ইসলাম ও রাসুল সা.-এর নির্বাচন বলে মানুষের সাথে ধোঁকাবাজি করলেন।

পঞ্চমত, আপনি রাসুল সা.-কে ঐসব কমিনা ফাসিকদের প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়ে দিলেন, যারা তাঁর সমকক্ষ বা কাছাকাছি হওয়া তো দূরের কথা, বরং তারা হলো আল্লাহর নিকৃষ্ট বান্দাদের অন্যতম। আপনি রাসুল সা.-কে এসব বাজে লোকদের সারিতে বসিয়ে দিলেন এ দাবি করে যে, স্বয়ং রাসুল সা.-ও এদের সাথে ভোটের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে!

এসব বেআদবি ও মূর্খতাসুলভ দিক কি কখনো ভেবে দেখেছেন? এতসব গোস্তাখি করেছেন, কখনো কি চিন্তা করে দেখেছেন? যা জানেন না, তা নিয়ে কেন কথা বলেন? সাহাবায়ে কিরাম রা. হাদিস বর্ণনা করার সময় কেঁপে উঠতেন। আতঙ্কে চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত। এ ভয়ে যে, না জানি অজান্তে রাসুল সা.- এর দিকে এমন কথা সম্বোধিত হয়ে যায়, যা রাসুল সা. বলেননি। অথচ তাঁরা নিশ্চিতই কথাটি রাসল সা.-এর মুখ থেকে শুনেছিলেন। তারপরও ভয় পেতেন। আতঙ্কে থাকতেন। আর আপনি কী করলেন? চিন্তা করতেও আমার ভয় লাগছে! শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে!! আল্লাহ

আপনার সুমতি ফিরিয়ে দিন এবং সঠিক রাহে ফিরিয়ে আনুন।

বি. দ্র: আপনার এসব মন্তব্য নিয়ে খণ্ডনের কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কিছু মানুষ আপনাকে অনুসরণ করে, আপনার কথাকে ওহির মতো বিশ্বাস করে, আপনার কথায় কোনো ভুল খুঁজে পায় না, তাদের সে মোহ ভাঙানোর জন্যই এ দীর্ঘ লেখাটির অবতারণা। এছাড়াও যারা আপনাদেরকে হক মনে করে, আপনাদের মৌলিক কোনো সমস্যা নেই বলে বিশ্বাস করে, তারাও যেন আপনাদের এসব ভুল, সীমালঙ্ঘন ও বিকৃতির ফিরিস্তি ভালো করে দেখে নেয়। আপনাদের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে মনে হয়, আপনাদের অবস্থা জামাতে ইসলামির চেয়ে ভালো নয়; বরং ক্ষেত্রবিশেষে তাদেরকেও ছাড়িয়ে গেছেন। তাই আপনারা নিজেদের যাই মনে করেন না কেন, আপনাদের এই হলো প্রকৃত অবস্থা। এখন আপনাদের ইচ্ছা, চাইলে ভুল মেনে নিয়ে সংশোধন করে নিতে পারেন, চাইলে এড়িয়ে যেতে পারেন, আর চাইলে এসবের বিপরীত দলিলভিত্তিক জবাব লিখতে পারেন।